Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফিয়া ফাইরুজ সেবা

রোলঃ 23100121740

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফিয়া ফাইরুজ সেবা

রোলঃ 23100121740

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফিয়া ফাইরুজ সেবা, আইডিঃ 23100121740 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আখিরাতে বিশ্বাস মানবজীবনে কি পরিবর্তন আনে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আফিয়া ফাইরুজ সেবা

আইডিঃ 23100121740

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

আখিরাত ও আক্বীদা 6

মানুষের জীবনের চরম সত্য 7

সফলতা কি? 8

কুরআন মাজীদে সফলতার কথা 9

নবীজির চোখে বুদ্ধিমানের সংজ্ঞা 12

মহান চার খলীফার অমীয় বাণী 13

মৃত্যুর পর মানুষের পাঁচটি অংশ 13

আল্লাহ কেনো মৃত্যু দিলেন? 14

মৃত্যুর কতিপয় প্রজ্ঞা 15

মৃত্যুর প্রস্তুতির অর্থ 16

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব 16

কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকত্ব 18

পরলোক যাত্রার পথে পথে 19

মৃত্যুর পর কবরের আযাব হয় কিনা,কবর প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হয় কিনা 20

পরকালীন জীবনের দৃষ্টান্ত 55

ঘুম থেকে উঠে মুমিনের ভাবনা 59

শেষ কথা 63

রেফারেন্স 64

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন আনে

﴿ كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوۡنَ أُجُورَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ١٨٥ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

অর্থাৎ "জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। যাকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)

মানব সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই 'বিশ্বাস' মানুষের জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি এবং কর্মের মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে আসছে । ইসলামী জীবনদর্শনে যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের ওপর মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে, তার মধ্যে তৌহিদ ও রিসালাতের পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো 'আখিরাত' বা পরকালের প্রতি অবিচল বিশ্বাস । এই পার্থিব জীবন মানুষের জন্য চিরস্থায়ী কোনো বাসস্থান নয়, বরং এটি কেবলই এক পরীক্ষাস্থল এবং আলমে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র মাত্র ।বর্তমান বস্তুবাদী বিশ্বে মানুষ যখন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চাকচিক্য, সম্পদ ও মোহের অন্ধকাহিনিতে নিমজ্জিত হয়ে নিজের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলে যাচ্ছে, তখন আখিরাতের চেতনা মানুষকে এক চরম সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায় । মৃত্যু যে কোনো সাধারণ সমাপ্তি নয়, বরং এক অনন্ত যাত্রার সূচনা এবং জবাবদিহিতার মঞ্চ—এই বোধ মানুষের চিন্তাজগৎ ও আচরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে । বক্ষ্যমাণ গবেষণাপত্রটিতে ইসলামী আকীদার আলোকে পরকালের গুরুত্ব, মৃত্যুর অমোঘ প্রজ্ঞা, পরলোক যাত্রার বিভিন্ন স্তর এবং সর্বোপরি আখিরাতের বিশ্বাস কীভাবে মানুষের প্রাত্যহিক ও নৈতিক জীবনকে সুন্দর ও জান্নাতী জীবনে রূপান্তরিত করে, তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে ।

আখিরাত ও আক্বীদা

আখিরাত বিশ্বাস কি?

ধর্মের মূল ভিত্তি হলো বিশ্বাস, আশা এবং ভালোবাসা। এর মধ্যে বিশ্বাস মানুষের জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড মূলত এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

বিশ্বাসের মৌলিক বিষয় তিনটি। যথা:

- তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস
- রিসালাত তথা নবী-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস
- আখিরাত অর্থাৎ পরকালের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মে অনুপ্রাণিত করে। পরকালে বিশ্বাসের অর্থ হলো মৃত্যুর পর পুনরায় অনন্ত জীবন লাভ করা, যেখানে মানুষের সকল কর্মের পূর্ণাঙ্গ হিসাব নেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে ভালো বা মন্দ ফলাফল হিসেবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম প্রদান করা হবে।

বিশ্বাসীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে আখিরাতে বিশ্বাস অন্যতম।

মানবজীবন পরিক্রমা চারটি জগতে বিভক্ত। যথা:

- আলমে আরওয়াহ
- আলমে দুনিয়া
- আলমে বারজাখ
- আলমে আখিরাত

মানুষ রূহ, নফস এবং দেহের সমন্বয়ে গঠিত। আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগতে কেবল রূহ ও নফস বিদ্যমান ছিল। এটি মানবজীবন চক্রের প্রথম স্তর।

আলমে দুনিয়া হলো পার্থিব জগৎ, যেখানে রূহ ও নফসের সঙ্গে দেহ যুক্ত হয়। মৃত্যুর মাধ্যমে এই জগতের সমাপ্তি ঘটে। এটি মানবজীবন চক্রের দ্বিতীয় স্তর।

মৃত্যুর পর রূহ ও নফস দেহ ত্যাগ করে আলমে বারজাখে প্রবেশ করে। এটি ব্যক্তির পার্থিব জীবনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী জীবনের সূচনা হিসেবে বিবেচিত।

মানুষের জীবনের চরম সত্য

আখিরাত বা পরকালীন জীবনের শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। সুতরাং মৃত্যু হলো পরকালের প্রবেশদ্বার। আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

" প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৮৫)।

মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে বাচতে পারবে না। বিভিন্ন যুগের জালেমরা যেমন মৃত্যু থেকে বাচতে পারেনি, এই যুগের জালেমরাও মৃত্যু থেকে বাচতে পারবেনা।
কোরআন মজিদে বলা হয়েছে-(সুরা জুমআ-৮)।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ

হে নবী, আপনি বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চাও, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের কাছে পৌঁছবে।

তারা যতই ক্ষমতা প্রয়োগ করুক অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ কাছে ফিরে যেতে হবে। আমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবো।

আল্লাহ তাআলা বলেন, [সূরা সজদা: ১১]

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

"বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত 'মালাকুল মওত' তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।"

এই পৃথিবীর বুকে অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ, শাসক, মহারাণী এসেছেন। তারা কেউ তাদের ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে যেতে পারেনি। এমনকি যখন তাদের জন্যে কবর খোদাই করা হয়, সেখানে কোনো গালিচা রাখা হয়নি, কোনো মখমলের বন্দোবস্ত করা হয়নি। সেখানে কোনো প্রদীপ রাখা হয়নি। ব্যস, যতটুক দেহ ততটুক কবর।

دو گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے

দু'গজের এই ছোট্ট জমিন,
এটাই তোমার ঘর,
এইখানেতে করবে বসত বাকি জীবনভর।

সফলতা কি?

সফলতা সব মানুষের জীবনেই পরম আরাধ্য। সময়ের পালাবদলে মানুষ অনেক সাফল্য নিজের ঝুড়িতে তোলে। কেউ পার্থিব জীবনের সাফল্যকে গুরুত্ব দেয় আবার কেউ গুরুত্ব দেয় পরকালীন সাফল্যকে। কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে নিজেকে সফলভাবে আবার কেউ নামাজ-রোজা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরে নিজেকে সফল মনে করে। সাধারণত সফলতা বলতে আমরা বুঝি গরিব থেকে ধনী হওয়া, কুঁড়েঘর থেকে উঁচু দালান তোলা, নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে সম্পদের পাহাড় গড়া, রিকশাচালকের ছেলে হয়েও বড় ব্যবসায়ী হওয়া, কষ্ট করে পড়াশোনা করার পাশাপাশি চাকরি করা ইত্যাদি। দুনিয়ায় প্রচলিত যেসব কাজকর্ম আছে, এসব কাজকর্মে টিকে থাকার নামই হচ্ছে বর্তমান সময়ের সফলতা এবং অনেকে এটাকেই আসল সফলতা হিসেবে মেনে নিচ্ছি। ক্ষণস্থায়ী জীবনের এই সফলতার ভাবনায় যারা মোহগ্রস্ত, তাদের উদ্দেশে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পার্থিব দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি অনুরাগ মানুষকে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন করে ফেলে। এ কারণে পরকাল সম্পর্কে জানা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা শুধু দুনিয়ার জ্ঞানেই জ্ঞানী।' (সুরা রুম : ৭)

আসলে মুসলিম নর-নারীর সবচেয়ে বড় সফলতা ও সফলতার মানদ- হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার ভয় অর্জন করা এবং রাসুলের (সা.) আদর্শে আদর্শবান হওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,
'যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই প্রকৃত সফলকাম' (সুরা নূর : ৫২)। একজন মুমিন ব্যক্তি সফলতা অর্জন করে নামাজের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই মুমিনরা সফল হয়েছে, যারা নিজদের নামাজে বিনয়াবনত, যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ, যারা জাকাতের ক্ষেত্রে স্বক্রীয়, যারা নিজদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী; তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না, অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী, আরও যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান, যারা নিজেদের নামাজের

হেফাজত করে; তারাই হবে ওয়ারিশ, জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিশ, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।' (সুরা মুমিনুন : ১-১১)

পার্থিব জীবনটাই তো আসলে তুচ্ছ, হজরত জাবের (রা.) বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি কানকাটা মৃত বকরির বাচ্চার কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এটাকে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পছন্দ করবে? তারা বললেন, আমরা তো এটাকে কোনো কিছুর বিনিময়েই নিতে পছন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু তুচ্ছ, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এবং তার সম্পদ তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ' (মুসলিম, মিশকাত : ৫১৫৭)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়া এবং তার সম্পদ নিয়ে থাকে, তাকে মহান আল্লাহ তায়ালাও ভালোবাসেন না।

দুনিয়ার জীবন খুবই মায়াবিনী এবং অল্প সময়ের ক্ষণস্থায়ী একটা পথ। এই পথ পাড়ি দিয়েই যেতে হবে চিরস্থায়ী জীবনে। কেউ জাহান্নামে, কেউ জান্নাতে। কেউ যদি এই মায়াবী পৃথিবীর সফলতা অর্জনের চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অধিক মনোযোগী হয়, তা হলে সেটাই হবে মুমিনের সবচেয়ে বড় ও আসল সফলতা। এক মুহূর্তের জন্যেও ভরসা নেই। যেকোনো সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে। কবি বলেছেন,

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساماں ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں

এমন কেনো হয়েছে মানুষ মরণ আসার নেই কোনো হুশ,
এক দণ্ডের গ্যারান্টি নেই শত বছরের বুনছে ফানুস।

কুরআন মাজীদে সফলতার কথা

ফলতা ও ব্যর্থতা অতি পরিচিত দুটি শব্দ। সবার কাছে এর সংজ্ঞা এক না হলেও দুনিয়ার সবাই সফলতা লাভ করতে চায়। ছোট থেকে ছোট কোনো কাজে সফল হওয়া। বড় থেকে বড় কোনো উদ্দেশ্যে সফল হওয়া। সুচিন্তিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়া। জীবনে সফল হওয়া। দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হওয়া। এজাতীয় বিভিন্ন ভাগ-বিভাগে মানুষ সফলতাকে ভাগ করে থাকে। এর মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি ও

অগ্রগতির হিসাব করে। তবে একজন মুমিনের জীবনে প্রকৃত সফলতা সেটাই, যার মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার রহমত ও সন্তুষ্টি লাভ করে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন পাড়ি দিয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনে সুখ ও শান্তি লাভ করে। আল্লাহ তাআলার নায ও নিআমতপূর্ণ জান্নাত লাভ করে। আযাব ও গযবের জাহান্নাম থেকে চিরমুক্তি লাভ করে।

যে কোনো মুসলমান জাগতিক বিষয়াদির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ফিকির করলে সফলতার এই সংজ্ঞায় একবাক্যে ঐকমত্য পোষণ করবে। এবং মনে-প্রাণে এই সফলতাকে কামনা করবে।

এই সফলতার কথা কুরআন মাজীদেও এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে এবং তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন (তোমাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। তখন যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। আর এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَمَوْضِعُ سَوط أَحَدكم فِي الْجَنّةِ خَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا.

قَالَ: ثُمّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

তোমাদের কারও চাবুক (-এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ) পরিমাণ জান্নাতের জায়গা, দুনিয়া ও দুনিয়ায় অবস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

হযরত সাহল রা. বলেন, একথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নি¤েœাক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। -তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/১৭৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০১৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৪১৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩১৭০

কুরআন মাজীদে আরও ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ.

সেদিন (কিয়ামতের দিন) যে ব্যক্তি থেকেই তা (জাহান্নামের শাস্তি) দূর করে দেওয়া হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই দয়া করলেন। আর সেটাই স্পষ্ট সফলতা। -সূরা আনআম (৬) : ১৬

সূরা মুমিনে মুমিনদের জন্য ফিরিশতাদের দুআর একটি অংশ লক্ষ করুন-

وَ قِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

(হে আমাদের প্রতিপালক!) তাদেরকে সব রকম মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করুন। আর সেদিন আপনি যাকে মন্দ বিষয়গুলো (অর্থাৎ জাহান্নাম ও জাহান্নামের শাস্তি) থেকে রক্ষা করলেন, নিশ্চয় তার প্রতি দয়া করলেন। আর সেটাই মহা সফলতা। -সূরা মুমিন (৪০) : ৯

কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার মাধ্যমে মুমিনদের সফলতা লাভের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

(হে নবী) সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন, তাদের সামনে ও ডান দিকে তাদের নূর ছুটাছুটি করছে। (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সফলতা। -সূরা হাদীদ (৫৭) : ১২

যে সফলতা কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, যে সফলতা হাদীসে নববীর বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত এবং বিবেকবান প্রত্যেক মুসলমানের চিন্তা ও ভাবনায় যা সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সফলতার প্রতি প্রত্যেকেরই আগ্রহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই সফলতা একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। অতএব এর জন্য যে কোনো ধরনের ত্যাগ ও সাধনাকে গ্রহণ করা উচিত। এর জন্য জীবন-প্রাণ বিলিয়ে কাজ করা উচিত। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ.

নিশ্চয় এটাই প্রকৃত অর্থে মহা সফলতা। এমন সফলতার জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত। -সূরা সাফফাত (৩৭) : ৬০-৬১

আরও ইরশাদ হয়েছে-

وَ فِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ.

এক্ষেত্রেই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। -সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ২৬

[মাসিক আল-কাউসার,মাওলানা মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম তায়্যিব]

নবীজির চোখে বুদ্ধিমানের সংজ্ঞা

دنیا بغیر موت کے ایک پیسہ کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی

মৃত্যুপূর্ব জীবনের এক আনাও মূল্য নেই।

একবার কয়েকজন যুবক সাহাবী রাদি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল,

مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ وَأَحْذَرُ النَّاسِ؟

'মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সমঝদার কে'?

নবীজি উত্তরে বললেন,

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ،

'মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হলো ওই ব্যক্তি যিনি মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করেন,

যিনি মৃত্যু আসার পূর্বে তার জন্যে অন্যদের চেয়ে বেশি প্রস্তুতি নিয়েছেন'।

أُولَئِكَ هُمُ الْأَكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

তারাই হলেন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, তারাই দুনিয়ার আভিজাত্য ও পরকালের মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়েছেন।

মিশকাত শরীফে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ .قَالُوا :وَمَا هَاذِمُ اللَّذَّاتِ؟ قَالَ :الْمَوْتُ

হে আমার সাহাবীরা, যে জিনিস দুনিয়ার সকল স্বাদ শেষ করে দেবে, তার কথা খুব বেশি স্মরণ করো। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সে জিনিসটি কী? নবীজি বললেন, মৃত্যু।

মহান চার খলীফার অমীয় বাণী

হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদি. বলেছেন,

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

'প্রতিটি মানুষ যদিও তার পরিবারের মাঝে দিনাতিপাত করছে। কিন্তু চরম সত্য হলো, মৃত্যু তার জুতোর ফিতার চেয়েও তার অনেক কাছে'। [আত তাহরীর ওয়াত তানভীর : ৩/১৭৪]

সাইয়্যিদিনা হযরত ওমর ফারুক রাদি. বলেছেন,

كَفَىٰ بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ

'হে ওমর, নসীহত হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট'। [আল ইবতিহার ফীমা আকা দালুশ শু'আরাউ মিনাল আসার : ১/২৯]

হযরত উসমান গনী রাদি. বলেছেন,

। يَكْفِيكَ الْإِسْلَامُ نِعْمَةً وَإِنَّ مِنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا يَكْفِيكَ الطَّاعَةُ مَشْغَلًا وَإِنَّآإِنَّ مِنْ نَعِيمِ الدُّنْ
.مِنَ الْعِبْرَةِ يَكْفِيكَ الْمَوْتُ عِبْرَةً

'নিঃসন্দেহে দুনিয়ার নি'আমতসমূহের মধ্য হতে ইসলাম নামক নি'আমতই তোমার জন্যে যথেষ্ট। দুনিয়ার সকল ব্যস্ততার মধ্য হতে নিঃসন্দেহে 'আল্লাহর আনুগত্য'-এর ব্যস্ততাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। আর এক মৃত্যুই তোমার জন্যে শিক্ষণীয় নসীহত হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে যথেষ্ট'।

মৃত্যুর পর মানুষের পাঁচটি অংশ

কিতাবে এসেছে, মৃত্যুর পর মানুষ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়-

প্রথমটি হলো, তার রূহ; যারা জান কবযকারী ফিরিশতা নিয়ে যান।

দ্বিতীয়টি হলো, মানবদেহ; যা কীট-পতঙ্গ খেয়ে ফেলে।

তৃতীয়টি হলো, তার ধন-সম্পদ; যা তার ওয়ারিসগণ বণ্টন করে নিয়ে যায়।

চতুর্থটি হলো, তার হাড়-গোড়; যা মাটি খেয়ে ফেলে।

পঞ্চমটি হলো, তার সৎকাজ; যা তার কাছে প্রাপক ঋণদাতারা নিয়ে যায়।

আল্লাহ কেনো মৃত্যু দিলেন?

একবার হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ রব্বুল ইযযতকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ, আপনি মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে আবার কেনো মেরে ফেলেন?
আল্লাহ উত্তর দিলেন, যাও, জমিনে ক্ষেতচাষ করো।
হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ক্ষেতে গমচাষ শুরু করলেন। কিছুদিন পর ক্ষেতের ফসল পেকে উঠলো। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন, ক্ষেত পেকে গেছে তখন তিনি ফসল কাটতে শুরু করলেন। একসময় কাটা শেষ হলো। সেখান থেকে তিনি দানা ও ভূষি পৃথক করলেন। ক্ষেতের ফসল পেকে উঠলো। হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন, ক্ষেত পেকে গেছে তখন তিনি ফসল কাটতে শুরু করলেন। একসময় কাটা শেষ হলো। সেখান থেকে তিনি দানা ও ভূষি পৃথক করলেন।
আল্লাহ তখন জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রিয় মুসা, তুমি গম গাছ কেটে দানা ও ভূষি কেনো পৃথক করলে?
হযরত মুসা উত্তরে বললেন, হে আমার মহান প্রভু, ফসল পেকে গিয়েছিলো। এ কারণে কেটে ফেলেছি।
আল্লাহ তখন বললেন, হে মুসা, আমিও তো এটাই করি। যখন মানবজীবনের ফসলের ক্ষেত পেকে ওঠে তখন আমি তা কেটে ফেলি। সেখান থেকে যারা দানার মতো লোক হয় তাদেরকে জান্নাতে পাঠাই। আর যারা ভূষির মতো লোক হয়, তাদেরকে জাহান্নামে পাঠাই।

মৃত্যুর কতিপয় প্রজ্ঞা

একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদবচন হলো,

فعل الحكيم لا يخلوا عن الحكمة.

‘বিজ্ঞের কোনো কাজ বিজ্ঞতা বহির্ভূত হয় না’

তারই সূত্র ধরে মৃত্যু যদিও একটি বেদনাদায়ক বিষয়, কিন্তু তার মাঝেও অনেকগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ হিকমত রয়েছে। যেমন,

১. মৃত্যুর মাধ্যমে কর্মের প্রতিফল স্বরূপ পুরস্কার ও দণ্ড লাভ হয়। যদি মৃত্যুই না হতো তাহলে নেককার লোকেরা তাদের সাধনা, অধ্যবসায় ও মেহনতের প্রতিফল কীভাবে পেতো? জালিম ও খুনীরা তাদের অপকর্মের শাস্তি কীভাবে পেতো? মৃত্যুই তো সব প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছে।

২. যদি মৃত্যু না আসতো তাহলে জমিনের উৎপাদন ব্যবস্থা চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়তো। আজ পৃথিবীতে পাঁচ মিলিয়ন মানুষ বাস করছে আর এতেই জন্মিয়ন্ত্রণের হৈচৈ পড়ে গেছে। যদি পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনশো মিলিয়ন হতো তাহলে কী হতো? হাদীস শরীফে এসেছে–

যাওমে মীসাক [তথা সৃষ্টির সূচনালগ্নে বান্দাদের কাছ থেকে আল্লাহর ‘রব’ স্বীকারোক্তি গ্রহণের দিন] সমস্ত মানবসন্তানকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়। সেদিন তাদের শরীরের কাঠামো ছিলো পিপীলিকার মতো। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে ফেরেশতাগণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, এতো লোক কোথায় আঁটবে! আল্লাহ বললেন, জমিনে। ফেরেশতাগণ নিবেদন করলেন, জায়গার সংকট দেখা দেবে। আল্লাহ বললেন, আমি তাদের জন্যে রাখবো মৃত্যুর অমোঘ বিধান। পেছনের জন যেতে থাকবে আর পরের জন আসতে থাকবে। জমিনের স্বল্পতা দেখা দেবে না। ফেরেশতাগণ বললেন, তাহলে তো তাদের জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। তারা সর্বক্ষণ মৃত্যুশঙ্কায় শঙ্কিত থাকবে। আল্লাহ বললেন, আমি তাদের ওপর আকাঙ্ক্ষার ফিরিস্তি এঁটে দেবো।

জমিনে ফেরেশতাগণ নিবেদন করলেন, জায়গার সংকট দেখা দেবে। আল্লাহ বললেন, আমি তাদের জন্যে রাখবো মৃত্যুর অমোঘ বিধান। পেছনের জন যেতে থাকবে আর পরের জন আসতে থাকবে। জমিনের স্বল্পতা দেখা দেবে না। ফেরেশতাগণ বললেন, তাহলে তো তাদের জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। তারা সর্বক্ষণ

মৃত্যুশঙ্কায় শঙ্কিত থাকবে। আল্লাহ বললেন, আমি তাদের ওপর আকাঙ্ক্ষার ফিরিস্তি এঁটে দেবো।

৩. যদি মৃত্যু বলে কিছু না থাকতো আর বড়রা জীবিত থাকতো তাহলে কখনো ছোটদের প্রতিভার বিকাশ ঘটতো না। একটি বচন প্রসিদ্ধ, كبرني موت الكبراء : বড়দের মৃত্যু আমাকে বড় বানিয়ে দিয়েছে। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর ওপারে না যেতেন তাহলে হযরত সিদ্দীকে আকবর রাদি.-এর দ্যুতি বিশ্বজাহান কীকরে দেখতো? ফারুক আহম রাদি.-এর ন্যায়পরায়ণতা বিশ্ববাসীর সামনে কীভাবে বিমূর্ত হতো? মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের এই স্বর্ণোজ্জ্বল ধারাবাহিকতা কীকরে অগ্রসর হতো? দ্বীনের হিফাযতের জন্যে জাতির শ্রেষ্ঠসন্তান উলামায়ে কেরামের অভূতপূর্ব ত্যাগস্বীকারের ইতিহাস কীভাবে সৃষ্টি হতো?

মৃত্যুর প্রস্তুতির অর্থ

এখন আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, আমরা কি সত্যিই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নিতে পেরেছি? আমরা কি মনের গহীনে এক আল্লাহকে বসাতে পেরেছি? মনের ভেতর আল্লাহর ভালোবাসা কি একনিষ্ঠতার সাথে জায়গা করতে পেরেছে? তোমার মুখের আল্লাহ আল্লাহ আওড়ানো কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন তোমার হৃদয়কে সামনে আনা হবে এবং সেখানে আল্লাহর ভালোবাসার নিরীক্ষা করা হবে। ইরশাদ হয়েছে,

মুখের জমা-খরচ কোনো কাজে আসবে না।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাত বিষয়ে সাধারণ বিশ্বাস

পরকাল বা আখিরাতে ঈমানের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা আছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাসসমূহ, কিয়ামত

বা পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওজন করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউয, জাহান্নামের উপর সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয় বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।(সূরা (২) বাকারা: ৬২ আয়াত।)

কুরআনে পরকালে বিশ্বাসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস সকল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সার্বজনীন বিশ্বাস, যা মানুষের জন্মগত অনুভূতির অংশ। পরকালের জীবনে বিশ্বাস ছাড়া স্রষ্টার প্রতি এই বিশ্বাস অর্থহীন হয়ে যায়। এই অর্থহীন বিশ্বাস ছিল মক্কার কাফিরদের মধ্যে। মক্কার কাফিরেরা ঈমানের অন্যান্য কিছু বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অনেকেই পরকালে বা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না এবং অনেকে অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ করত। কুরআন কারীমে কাফিরদের এ বিভ্রান্তি এবং আখিরাতে বিশ্বাসের আবশ্যকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারংবার আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আখিরাতের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তাদের অবিশ্বাস বিষয়ক যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করা হয়েছে এবং সেগুলির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কুরআনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা। কুরআন কারীমে ঈমানের নির্দেশনা জ্ঞাপক আয়াতগুলিতে সর্বদা 'আখিরাত' বা 'শেষ দিবসে' ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ক কয়েকটি নির্দেশ দেখেছি।

বস্তুত কুরআন কারীম পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে: (১) আল্লাহর ইবাদতের একত্ব বা তাওহীদুল ইবাদাত এবং (২) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব। কুরআন কারীমের এমন একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কষ্ট যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোনো না কোনো বর্ণনা নেই।

আমরা সাধারণভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লায় বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্খলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথ: (১) শিরকে নিপতিত হওয়া এবং (২) আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। অনেক সময় বিশ্বাসী মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা, অস্থিরতা, অসচেতনতা বা শয়তানী প্ররোচনার কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন বা আখিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। এই ভয়ঙ্করতম পদস্খলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আখিরাতের স্মরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্যত তাওহীদুল ইবাদাত ও আখিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপ্রদানের এ হলো একটি কারণ।

মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করা সব নবীদের শিক্ষার অংশ ছিল এবং একজন মুসলিম হওয়ার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যখন আমাদের কোনো কাজ করতে বলা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমরা সেই কাজের উপকারিতা ও ক্ষতির কথা ভাবি। যে কাজকে আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করি, তা করতে আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। একইভাবে, যে জিনিস ক্ষতিকর নয় বলে মনে হয়, তা থেকেও আমরা খুব বেশি দূরে থাকতে চাই না।

কোনো কিছুর উপকারিতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস যত গভীর হয়, সেই ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়াও তত দৃঢ় হয়। আর যদি উপকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, তাহলে আমাদের মনোভাবও দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

একটি শিশু কেন আগুনে হাত দেয়? কারণ সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয় যে আগুন পোড়ায়। সে কেন পড়াশোনা এড়িয়ে চলে? কারণ সে শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী, তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। (WhyIslam, 2017)

কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকত্ব

পবিত্র কুরআনে 'আখিরাত' (*al-Ākhirah*) এবং 'দুনিয়া' (*al-Dunyā*)—উভয় শব্দই ১১৫ বার করে এসেছে। এই তথ্যটি মূলত কুরআনের গাণিতিক অলৌকিকত্ব (*Numerical Miracles of the Qur'an*) বিষয়ক গবেষণার অংশ।

১. ড. আব্দুল রাজ্জাক নওফাল (Dr. Abd al-Razzaq Nawfal): তার বিখ্যাত গ্রন্থ *"Al-I'jāz al-'Adadī fi al-Qur'ān al-Karīm"* (*The*

Numerical Miracle in the Holy Qur'an)-এ তিনি প্রথম এ ধরনের শব্দগত সামঞ্জস্যের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, কুরআনে বিপরীতার্থক শব্দগুলো প্রায়ই সমপরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ড. রাশাদ খলিফা (Dr. Rashad Khalifa): কুরআনের শব্দগণনা-ভিত্তিক আধুনিক গবেষণায় তার কাজ উল্লেখযোগ্য। তার গবেষণাতেও 'আখিরাত' ও 'দুনিয়া' শব্দের সংখ্যাগত ভারসাম্যের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরলোক যাত্রার পথে পথে

মুসলমান ভাইয়েরা, আখেরাতের যাত্রাপথে আপনাকে পাঁচটি মঞ্জিল অতিক্রম করতে হবে।

প্রথম মঞ্জিল

প্রথম মঞ্জিল হলো, মৃত্যুযন্ত্রণার মঞ্জিল। মৃত্যুর প্রাক্কালে যখন মানুষের নিঃশ্বাসে হেঁচকি ওঠে সেটিকে আরবীতে সাকারাত (سكرات) বা (نزع) বলা হয়। এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বপর্যন্ত ওই ব্যক্তির জন্যে তাওবার দরজা খোলা থাকে। ওই সময় নেককার ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্যে জান্নাতের ফেরেশতা আগমন করে থাকেন। এ কারণে কিছু কিছু বুযুর্গের মৃত্যুর সময় এই আহ্বান ভেসে আসে,

'হে ওই আত্মা যা ছিলো আল্লাহর আনুগত্যে প্রশান্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার দিকে এমনভাবে ফিরে এসো যে, তুমি তার ওপর সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার ওপর সন্তুষ্ট। তুমি আমার বান্দাদের সারিতে উঠে এসো এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'

আর যখন গুনাহগার লোকের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তার জন্যে জাহান্নামের ফেরেশতা আসে। তার কাছে জাহান্নামের হাতুড়ি থাকে। তার আর যখন গুনাহগার লোকের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তার জন্যে জাহান্নামের ফেরেশতা আসে। তার কাছে জাহান্নামের হাতুড়ি থাকে। তার

রূহ কবয করার সময় এতোটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে পড়ে যে, এর জন্যে ফেরেশতাকে নাকের ওপর রুমাল রাখতে হয়। বিবরণ শোনানোর সময় নবীজি নাকের ওপর রুমাল রাখার দৃশ্য করে দেখিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মঞ্জিল

পরকালযাত্রার দ্বিতীয় মঞ্জিল হলো, কবর। হাদীস শরীফে এসেছে, তোমরা কবরকে মাটির নিরেট স্তূপ মনে করো না। এটি হয়তো সমাহিত ব্যক্তির কবরকে মাটির নিরেট স্তূপ মনে করো না। এটি হয়তো সমাহিত ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের অন্যতম একটি বাগান হবে অথবা জাহান্নামের অন্যতম একটি গহ্বর হবে।

যখন কোনো নেককার মানুষকে কবরে রাখা হয়, তখন তাকে সম্বোধন করে কবর বলে, দুনিয়ার বুকে যতো মানুষ ছিলো, তাদের সবার মধ্য হতে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা বেশি ছিলো। এখন তুমি আমার কাছে চলে এসেছো। কাজেই তোমার সাথে আমার সদাচরণ দেখবে। এরপর ওই কবরটি এতোটা প্রশস্ত হয়ে পড়ে যে, মৃত ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেটি প্রশস্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন কোনো পাপাচারী ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তাকে সম্বোধন করে কবর বলে, দুনিয়ার বুকে যতো মানুষ বসবাস করতো তাদের সবার মধ্য হতে তোমার প্রতিই আমার সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ছিলো। এখন তুমি আমার কাছে চলে এসেছো। কাজেই তোমার সাথে আমি কেমন আচরণ করি, তা এখুনি তুমি দেখতে পাবে। এ কথা বলে কবর তাকে এমনভাবে চেপে ঠেসে ধরবে যে, তার বুকের একদিকের হাড় অন্যদিকে হাড়ের ভেতর ঢুকে যাবে।

মৃত্যুর পর কবরের আযাব হয় কিনা,কবর প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হয় কিনা

কবরের আযাব, কবরের প্রশস্ত ও সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, কবর জাহান্নামের অংশ বা জান্নাতের বাগিচা হয়ে যাওয়া, কবরের মৃত ব্যক্তিদের বসা ইত্যাদি বিষয় যারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে না, তাদেরকে কি বলা যেতে পারে। তাদের কথা হচ্ছে, যে কোন কবর খুলে দেখলে সেখানে অন্ধ ও বধির ফেরেশতা যাঁরা লোহার হাতুড়ি দ্বারা মৃতদেরকে প্রহার করেন তাঁদেরকে দেখা যায় না। সেখানে কোন অজগর সাপ বা প্রজ্জ্বলিত আগুনও দেখা যায় না। এমনকি মৃত দেহের মধ্যেও এগুলোর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। মৃত দেহকে অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়, আর যদি মৃতদের চোখের উপর পারদ আর বুকের উপর সরষে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলোকে ঠিক সে অবস্থায় দেখা যায়। এমনিভাবে কবরের সংকীর্ণতা বা প্রশস্ত তা মানুষের দৃষ্টিগোচর

হয় না। কবরের যে পরিমাণ জায়গা খনন করা হয় ঠিক তদ্রূপই দেখা যায়। ছোট্ট একটি কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দেহ, ফেরেশতা, বিবিধ আকৃতিধারী আমলসমূহ সে স্বল্প পরিসরে কিভাবে সংকুলন হতে পারে? বিদ'আতী ও গুমরাহ লোকদের ধারণা, যেসব কথা সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেচনায় আসে না তা অবশ্যই ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন। ফাঁসি কাষ্ঠে দীর্ঘদিন মৃত ব্যক্তির দেহ লটকে থাকলে তখন তার সওয়াল জবাব কিভাবে হয়? কবরের মধ্যে দেহের কোন প্রকার নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায় না আর ঐ দেহে কোন আগুন ও দৃষ্টিগোচর হয় না। যেসব মৃত দেহকে হিংস্র জন্তু কিম্বা পাখিরা খেয়ে ফেলে এবং মৃত দেহের অংশগুলো তাদের পেটে হজম হয়ে যায় কিংবা যাদের দেহ পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয় বা সমুদ্রে বা নদ-নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়, মৃত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সে অবস্থায় কি করে মৃত ব্যক্তিদের সওয়াল-জবাব হয়? কি করে ওদের সামনে ফেরেশতারা উপস্থিত হন? কি করে কবর জান্নাতের বাগিচা বা জাহান্নামের অংশে পরিণত হয়? কি করে তাদেরকে কবর চাপ দেয়? এসব বিষয় সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

এক- এই সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কেরাম এমন কোন তথ্য প্রদান করেননি যা জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী বা একেবারেই অসম্ভব। বরং তাঁরা দু'রকমের খবর দিয়েছেন।

ক. কোনগুলোতে এমন যে, যেগুলো সহজ ও সরল প্রকৃতির লোক মেনে নেয় এবং এগুলোর সত্যতা সাক্ষ্য প্রদান করে।

খ. আবার তাঁরা এমন সব কথা বলেছেন, যা সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। যেমন, গায়েবের খবর, বরযখ ও কিয়ামতের বিস্তারিত বৃত্তান্ত, কবরের আযাব ও আরামের খুঁটি-নাটি বিষয় ইত্যাদি। আম্বিয়ায়ে কেরামের বর্ণিত বিষয়গুলো কখনো জ্ঞান বা যুক্তির পরিপন্থী নয়। তবে যে বিষয়গুলো সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনানার পরিপন্থী বলে ধারণা করা হয় সেগুলো দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে। হয় সেটা মিথ্যা খবর যা আম্বিয়ায়ে কেরাম উল্লেখ করেননি বরং সেগুলো তাঁদের অভিমত বলে প্রচারিত। তবে সেটা বাতিল বুদ্ধি-বিবেচনা প্রসূত বা শয়তানী ধ্যান-ধারণাজনিত প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "হে নবী! জ্ঞানী লোকেরা ভালোভাবেই জানেন যে, আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে এটা মানুষকে পুরোপুরি সত্য এবং পরাক্রমশালী মহা প্রশংসিত আল্লাহর পথ নির্দেশ করে।" (সূরা সাবা : আয়াত-৬)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে অন্যত্র আরো ইরশাদ করেছেন, “আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এই কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল-এর কতক অংশ অস্বীকার করে। বলো, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। কাজেই আমি তাঁর দিকেই আহ্বান করছি, আর তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।” (সূরা রাদ : আয়াত-৩৬)

উল্লেখ্য যে, মানুষের বিবেক কখনো অসম্ভব কথায় পরিতৃপ্ত হয় না। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, “হে মানব সমাজ, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে, এটা মানব মনের যাবতীয় ব্যাধির পূর্ণ নিরাময়কারী, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। হে নবী! বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে তিনি এটা পাঠিয়েছেন। এ জন্য তাঁদের আনন্দ উল্লাস করা উচিত। এটা সেসব জিনিস হতে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ত করেছে।” (সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭, ৫৮)

যা কিছু অবাস্তব ও অসম্ভব তার মধ্যে কোন রোগমুক্তি, হিদায়াত, রহমত আশা করা যায় না এবং তাতে কেউ সন্তুষ্টও হতে পারে না। এরূপ সন্দেহে ঐসব লোক পতিত হয়, যাদের অন্তরে ঈমানের শিকড় সুদৃঢ় হতে পারেনি ও যাদের কদম ইসলামের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এজন্য তারা সব সময় সন্দেহ ও সিদ্ধান্ত হীনতায় এবং অস্থিরতায় ভোগে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কোন বাণীর মর্মার্থ কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া গ্রহণ করতে হবে। তাঁর বাণীর এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা অনুচিত যেই অর্থের কোন গ্রহণযোগ্যতা ও সারবত্তা নেই। উপরোক্ত মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ নিয়ত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন জ্ঞানী এবং মহৎ ব্যক্তির মধ্যে সঠিক উপলব্ধির অভাব দেখা যায়।

পক্ষান্তরে, ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারীদের নিয়ত কলুষিত ও বিকৃত হওয়ার কারণে মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তারা উল্টোটাই বুঝে। এভাবে দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাধনা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা দেখা দেয়। আসলে, মারজিয়াহ, কাদরিয়া, খারিজী, মুতাযিলা, জাহমিয়াহ ইত্যাদি ফিরকার গুমরাহির এটাই প্রধান কারণ। এসব ভ্রান্ত ফিরকার কারণে দ্বীন ইসলামের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাণী থেকে ও

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীনের জ্ঞানের উৎস থেকে তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতিও তারা মোটেই কোন ভ্রূক্ষেপ প্রদান করেনি। উপরোক্ত অভিমতের স্বপক্ষে বহু উদ্ধৃতি বাদ দেয়া হলো। অন্যথায় এ সম্পর্কে দশ হাজারেরও বেশি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিতাপের বিষয় এই যে, উক্ত গুমরাহ ফিরকার প্রবক্তারা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও শরী'আতের বিধি-বিধানকে মোটেই উপলব্ধি করতে পারেনি। বস্তুত পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা ও মর্মবাণীকে তাঁরাই যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাঁরা আগেকার দিনের হিদায়াতপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের আদেশ ও ধ্যান ধারণার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত। ভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীরা অতি সুকৌশলে তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য দ্বীনী মাসয়ালা-মাসায়েলকে নানাভাবে বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, তিনি আমাদেরকে এসব ভ্রান্ত ফিরকার আবর্ত থেকে রক্ষা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য তিন প্রকারের আবাসস্থল তৈরি করে রেখেছেন, যথা, দুনিয়া, বরযখ ও আখিরাত। এই সব আবাসস্থলের জন্য তিনি বিশেষ ধরনের নিয়ম-কানুন ও হুকুম-আহকাম তৈরি করেছেন। আর তিনি মানুষকে দেহ ও রূহের দ্বারা সুগঠিত করেছেন। দুনিয়ার হুকুম-আহকাম দেহের উপরেই প্রযোজ্য। এজন্যই শরীআতের হুকুম আহকাম, মানুষের কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও কাজ কর্মের উপর কার্যকর হয়, তাদের মনের চিন্তাধারা ও কল্পনার উপর নয়। অপরপক্ষে বরযখী জীবনের হুকুম-আহকাম ও কার্যকারণ রূহের সাথে সম্পৃক্ত। পার্থিব ব্যাপারে রূহ দেহের অনুসরণ করে, মানুষ সুখ, দুঃখ ও ব্যথা-বেদনা অনুভব করে। এর কারণ এই যে, দেহের মাধ্যমেই রূহ প্রভাবিত হয়। তেমনি বরযখে সুখ-দুঃখের সম্পর্ক সরাসরি রূহের সাথে হয়ে থাকে। আর রূহের মাধ্যমে দেহের উপরও এর প্রভাব পড়ে। দেহ হলো প্রকাশ্য একটি সত্তা। কিন্তু রূহ হলো অপ্রকাশ্য সত্তা। এছাড়া দেহ হলো রূহের অস্থায়ী নিবাস। তবে বরযখে রূহ হচ্ছে সক্রিয় একটি সত্তা, আর দেহ অপ্রকাশ্যভাবে কবরে বিদ্যমান থাকে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর হিদায়াত ও অনুগ্রহে দুনিয়ার মধ্যে বরযখের একটি নমুনা একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির মাধ্যমে দান করেছেন। আমাদের স্বপ্নের মধ্যে যে আনন্দ ও দুঃখ বেদনা পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে এটা রূহের মাধ্যমে সংঘটিত হয় এবং এর প্রভাব দেহের উপরও পড়ে। আবার কোন কোন সময় এরূপ স্বপ্ন এতো বেশি

বাস্তবমুখী হয়ে থাকে যে, তার কার্যকারিতা নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার পরেও অনুভূত হয়। যথা কেউ স্বপ্নে দেখলো, কেউ তাকে প্রহার করছে, আর সে চিৎকার করছে, জাগ্রত হওয়ার পরে সে আঘাতের চিহ্ন তার দেহের মধ্যে দেখতে পায়। অথবা কেউ স্বপ্নে দেখলো, সে কোন কিছু খেয়েছে, জেগে ওঠার পর সে খাবারের স্বাদ ঐ ব্যক্তি অনুভব করে থাকে। এমনকি একজন নিদ্রিত ব্যক্তির ক্ষুধা পিপাসাও এইভাবে নিবৃত্ত হয়ে যায়।

এভাবে একজন নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখা অবস্থায় দাঁড়িয়েও যায় এবং একজন জাগ্রত মানুষের ন্যায় কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যকে মারধরও করে। অথচ সেই ব্যক্তি তখনও নিদ্রিত অবস্থায় দুনিয়ার সকল বিষয় সম্পর্কে থাকে অনবহিত ও বিচ্ছিন্ন। রূহ যখন এইভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে তখন সময় সময় অন্য দেহের সাহায্যও গ্রহণ করে। কেননা রূহ যদি নিদ্রিত ব্যক্তির দেহে ফিরে আসতো তাহলে সে ব্যক্তি জেগেই যেতো আর সব বিষয় অনুভব করতে পারতো। অতএব কোন নিদ্রিত ব্যক্তির রূহ যেমন একাকিত্বে প্রভাবান্বিত হয়, ঠিক তেমনি বরযখী রূহের একাকিত্ব আরো গভীরভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় দেহের উপর এর প্রতিক্রিয়া কার্যকর হয়। মৃত্যুজনিত কারণে দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক একেবারেই শেষ হয়ে যায় না, তখনও এক প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। মৃত্যুর পরে দেহ পুরোপুরি অটুট থাকুক অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটি, পানি বা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশে অন্য কোন আকৃতি বা রূপ ধারণ করুক, তবে কিয়ামতের দিন দেহ ও রূহ সরাসরি আযাব বা আরাম ভোগ করবে। এই রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে যখন উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের সমাধান হয়ে যাবে। আর এটাও বুঝা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত কবরের আযাব বা আরাম, কবর প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হওয়া, জাহান্নামের অংশ বা জান্নাতের উদ্যানে পরিণত হওয়া ইত্যাদি বিষয় বিবেক-বুদ্ধি সম্মত ও সন্দেহ বিবর্জিত। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন,

"অনেক কথাই সঠিক ও সত্য কিন্তু যে বুঝবে তার বোধ শক্তি হলো দুর্বল ও ক্ষীণ।"

এটা কি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, দু'জন লোক বিছানায় ঘুমাচ্ছে, কিন্তু একজনের রূহ নিয়ামত ভোগ করছে আর অন্যজনের রূহ শাস্তি ভোগ করছে। তারপর তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজ নিজ দেহে কোন কোন সময় শান্তি বা শাস্তির চিহ্ন দেখতে পায়। আলমে বরযখের অবস্থা তো এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক। বরযখও আখিরাতের বিষয়সমূহ মানুষের সাধারণ অনুভূতি ও

উপলব্ধির নাগালের বাইরে। আল্লাহ তা‘আলা বরযখ ও আখিরাতের বিষয়সমূহ দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন, যা তাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। এটাই আল্লাহ তা‘আলার রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব যাতে করে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। দুনিয়াতেই জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ফেরেশতাদের আগমন ঘটে। দুনিয়া থেকে বিদায়ী ব্যক্তি তাদেরকে দেখতে পায়। ফেরেশতারা তার কাছে এসে বসে যান ও তার সাথে কথাবার্তা বলেন। তাঁদের নিকট জান্নাত বা জাহান্নামের কাফন, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ মওজুদ থাকে। তাঁরা উপস্থিত লোকজনদের দুআর সময় আমীনও বলে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তিকে সালাম করে থাকেন আর সে ব্যক্তি তাঁদের সালামের উত্তরও দিয়ে থাকেন। আর ঐ ব্যক্তি যদি সালামের উত্তর মুখে দিতে বা ইশারাও করতে না পারেন, তাহলে তিনি মনে মনেই এর জবাব দিয়ে থাকেন। এই কারণে কোন কোন সময় আসুন, আসুন, তাশরীফ নিয়ে আসুন, বলতে শোনা যায়। গ্রন্থকারের মহা সম্মানিত উস্তাদ থেকে বর্ণিত, জনৈক নেককার মৃত্যুপথ যাত্রী ঠিক তার শেষ মুহূর্তে আসুন, আসুন, তাশরীফ রাখুন ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে ফেরেশতাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

হযরত খাইরুন নাসসাজ (র) তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, আমি সবর করবো, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মাফ করুন, তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে নির্দেশ তা অপরিবর্তনীয়, এর কোন হেরফের হবে না, আমার আয়ুর পেয়ালা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তিনি বলেছিলেন, এখন তোমরা তোমাদের রবের নির্দেশ পালন করো, এই বলে তিনি চিরবিদায় নিয়েছিলেন। হযরত খাইরুন নাসসাজ (র) এর উক্ত ঘটনাটি বহুল প্রচারিত ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ইবনে আবিদ দুনিয়া তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) যে দিন শেষ বিদায় নেবেন, সেদিন তিনি বলেছিলেন, আমাকে তুলে বসাও। সেখানে উপস্থিত লোকজন তাঁকে উঠিয়ে বসালেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, আমি হচ্ছি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকাম পালনে অবহেলা করেছি, আর গুনাহ করতে সংকোচবোধ করিনি। এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করে কালিমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” পাঠ করলেন এবং মাথা তুলে মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এতো মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন। সে অবস্থায় তিনি

বলেছিলেন, আমি এমন অদ্ভুত ধরনের আকৃতিধারীদেরকে দেখছি যাঁরা ইনসান বা জিন নন। তারপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, হযরত মাসলামাহ (র) বর্ণনা করেছেন : তিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর অন্তিম সময়ে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে আমাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে বললেন। আমরা সবাই বাইরে চলে গেলাম এবং একটি গম্বুযের পাশে বসে গেলাম তখন একজন মাত্র খাদিম তাঁর কাছে ভেতরে রইলো। সে সময় তিনি কুরআন শরীফের যে পবিত্র আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন সে আয়াতের অর্থ হলো, "এই পরলোকের ঘর যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য; যারা দুনিয়াতে বড় হতে চায় না, অশান্তি সৃষ্টি করে না। আল্লাহভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম"। (সূরা আল-কাসাস : আয়াত-৮৩) এই পবিত্র আয়াত পাঠের পর তিনি বলে উঠলেন– "নিশ্চয় তোমরা মানুষও নও, জিনও নও"। তারপর খাদিম বাইরে এসে আমাদেরকে ভেতরে যেতে বললো। আমরা ভেতরে গিয়ে দেখলাম তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন।

হযরত ফুযালা ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত : তিনি মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি' (র)-এর অন্তিম সময়ে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলতে লাগলেন, "হে আমার ফেরেশতা, এসো, যাবতীয় ক্ষমতা ও শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস একমাত্র আল্লাহ"। সেই সময় অতিশয় প্রিয় ও প্রাণ মাতানো খুশবু ভেসে এলো। তারপর তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো এবং তিনি চিরবিদায় নিলেন।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর সমর্থনে বহু নির্ভরযোগ্য হাদীস বিদ্যমান আছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "অতঃপর যখন কারো প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তাকিয়ে থাকো, তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না"। (সূরা ওয়াকিয়াহ : আয়াত-৮৩-৯৫)

অর্থাৎ আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তোমাদের চেয়েও বেশি তার নিকটবর্তী হন, কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে দেখতে পাও না। এটা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্ত আর বরযখী জীবনের শুরু। এ কারণেই মৃত্যু পথযাত্রীর সামনে থেকে পর্দা তুলে দেয়া হয়। সে সময়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তি যা কিছু দেখতে পায়, দুনিয়ার মানুষ তা দেখতে পায় না। অতঃপর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে রূহকে সম্বোধন করেন এবং সেই রূহকে কবয করে নেন। মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত লোকজনরা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পান না, তাঁদের কথাও শুনতে পান না।

এইভাবে দেহ থেকে রূহ বের হয়ে আসে। নেককার বান্দার রূহ থেকে তখন সূর্যের কিরণের ন্যায় আলো এবং মেশকের চেয়ে অধিক প্রাণ মাতানো খুশবু ভেসে আসতে থাকে। উপস্থিত লোকজনরা সে আলোর কিরণ দেখতে পান না, তবে সে খুশবু অনুভব করে থাকেন। তারপর ফেরেশতারা যে রূহকে আকাশে নিয়ে যান, তাও কেউ দেখতে পায় না।

রূহকে আবার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং সেই রূহ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া সবকিছু প্রত্যক্ষ করে আর বলতে থাকে; "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, তাড়াতাড়ি করো? কিন্তু তার এসব কথা মানুষ শুনতে পায় না। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতারা লাশকে মাটি দেয়ার পর কবরে আসেন। তাঁদের জন্য কবরের উপরের মাটি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। মাটি খুঁড়ে, পাথর কেটে তার মধ্যে লাশ রেখে সীসা গলিয়ে কবরের মুখ সীল মোহর করে দিলেও, ফেরেশতারা লাশের নিকট পৌঁছে যান। কেননা স্থূলবস্তুকে সূক্ষ্মদেহী ফেরেশতারা অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারেন। এমনকি জিনেরা ও সেসব বাধা অতিক্রম করতে পারে। পাখিরা যেমন হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় ফেরেশতারাও তেমনি স্থূলবস্তু জগতে সাঁতরিয়ে বেড়ান।

একজন নেককার বান্দার জন্য তাঁর কবরের প্রশস্ততা কোন মাধ্যম ছাড়াই হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, রূহের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তবে দেহের জন্য কবরের প্রশস্ততা রূহের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আলমে বরযখের ঘটনাবলী রূহের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আর দেহের সাথে রূহের মাধ্যমে সেটা কার্যকর হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কবরের মধ্যে নেককার বান্দার লাশ দু'তিন হাত জায়গায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে কবর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। যদি কোন কবর খুলে দেখা হয়, তাহলে লাশটিকে স্বাভাবিক অবস্থায়ই দেখা যায়। কিন্তু কবর কোন কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, এদিকের পাঁজরের হাড় ওদিকের ও ওদিকের পাঁজরের হাড় এদিকে ঢুকে পড়ে। এই যে অবস্থা এটা সাধারণ উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও সহজাত ধ্যান-ধারণার বহির্ভূত একটি ব্যাপার। যদি কোন লাশ কবর ছাড়া অন্য কোথাও রাখা হয় তবুও একথা বলা যাবে না যে সে লাশটি কবরের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত কবরের এই সব ঘটনাবলী যারা বিশ্বাস করে না তারা ধর্মহীন বা বেঈমান ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিশ্বস্ত ও নেককার ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে, একবার তিনি তিনটি কবর খনন করেছিলেন।

খনন করার পর বিশ্রাম করতে গিয়ে তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তখন তিনি স্বপ্নে দেখলেন আকাশ থেকে দু'জন ফেরেশতা সেখানে নেমে আসলেন এবং উক্ত তিনটি কবরের মধ্যে থেকে একটি কবরের নিকট দাঁড়িয়ে ফেরেশতারা একে অপরকে বললেন, এ কবরটির পরিধি হবে তিন মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ, লিখে নিন। তারপর দ্বিতীয় কবরটির নিকট গিয়ে তাঁরা বললেন, এর আয়তন হবে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া, এটাও লিখে নিন। তারপর তৃতীয় কবরটির কাছে গিয়ে বললেন, এর আয়তন হবে মাত্র আধ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া, লিখে নিন। এরপর তার ঘুম ভেঙে গেলো। এর মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির জানাযা সেখানে নিয়ে আসা হলো। তাঁকে প্রথম কবরটিতে দাফন করা হলো। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির জানাযা আনা হলো। তাঁকে দ্বিতীয় কবরটিতে দাফন করা হলো। অবশেষে শহরের একজন বিখ্যাত ও মালদার মহিলার জানাযা আনা হলো। সেই জানাযায় শহরের প্রত্যেক এলাকার সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শরীক হলেন। সেই জানাযায় ছিলো মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। তৃতীয় কবরটিতে সেই মহিলাটিকে দাফন করা হলো, যে কবর সম্পর্কে ফেরেশতারা বলেছিলেন যে, এটার আয়তন হবে মাত্র আধ ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া।

কবরের আগুন ও কবরের বাগান, দুনিয়ার আগুন ও দুনিয়ার বাগানের মতো নয় যে, দুনিয়ার মানুষ তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। বরং আখিরাতের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আর আখিরাতের বাগান দুনিয়ার বাগানের চেয়ে অনেক বেশি মনোরম। আখিরাতের অবস্থা দুনিয়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, বরং যে মাটি ও পাথরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় আল্লাহ তা'আলা সেই মাটি ও পাথরকে উত্তপ্ত করে দেন। আর সেগুলো দুনিয়ার সাধারণ মাটি ও পাথরের চেয়ে অনেক বেশি উত্তপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তা স্পর্শ করলেও বিন্দুমাত্র গরম অনুভব করে না। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কবরের ঐ মাটি ও পাথরকে মনোরম বাগ-বাগিচায় পরিণত করে দেন। এমনকি একই কবরের দু'ব্যক্তি সমাহিত হলেও একজনের জন্য সেই কবরটি জাহান্নামে পরিণত হতে পারে, আর এর উত্তাপ অন্যজনের অনুভূত হয় না। একইভাবে কবরে সমাহিত অপর ব্যক্তির জন্য জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও অন্যান্য আরামদায়ক নিয়ামত ও সুখ অপর ব্যক্তির অনুভূত হয় না। বস্তুতঃ মহান আল্লাহর কুদরত এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দুনিয়ায় তাঁর কুদরতের আশ্চর্যজনক নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন।

কিন্তু মানুষ তা বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে না, সেগুলোকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ সেসব বিষয়ে উপলব্ধি করার জ্ঞান ও শক্তি দিয়েছেন ও অসত্য থেকে রক্ষা করেছেন তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। অপরপক্ষে, কাফিরদের কবরে আগুনের দু'টি তক্তা বিছিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। যার ফলে তাদের কবর তন্দুরের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। কাফিরদের এই অবস্থা আল্লাহ তা'আলা তার কোন কোন বান্দাকে অবহিত করে থাকেন যদিও অন্যদের কাছে তা অজ্ঞাত থেকে যায়। কবরের এ অবস্থা সবাই যদি জানতে পারে তাহলে গায়েবের প্রতি মানুষের ঈমান কি করে ঠিক থাকবে? সেক্ষেত্রে মানুষ মৃতদেরকে কবরে দাফন করাই ছেড়ে দেবে। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, তোমরা মৃতদের দাফন করা ছেড়ে দেবে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম, যেন আমার ন্যায় তোমাদেরকেও তিনি কবরের আযাব দেখিয়ে দেন ও শুনিয়ে দেন। (বুখারী, মুসলিম) যেহেতু পশুদের মধ্যে এ রহস্য উপলব্ধি করার শক্তি নেই তাই এরা কবরের আযাব শুনতে পায় এবং বুঝতেও পারে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চর কবরবাসীর কবরের আযাব শুনে এমন লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিলো মনে হচ্ছিলো যেন তাঁকে তার পিঠ থেকে ফেলে দেবে।

এই প্রসঙ্গে হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উযায়ের হাররানী (র) বলেন, আমি 'আমদ' নামক স্থানে আসরের নামায পড়ে আমার ঘর থেকে বের হয়ে একটি বাগানের দিকে গেলাম এবং সূর্যাস্তের একটু আগে কয়েকটি কবরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, একটি কবর কর্মকারের চুল্লীর মতো জ্বল জ্বল করছে। আর মৃত ব্যক্তি সেই কবরে সমাহিত আছে। আমি আমার চোখ ঘষতে লাগলাম এবং ভাবতে লাগলাম, আমি কি জেগে আছি নাকি ঘুমিয়ে আছি। তারপর শহরের পাঁচিল দেখে আমার সম্বিত ফিরে এলো। বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থায় বাড়িতে পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসলাম। আমার সামনে খাবার দেয়া হলো কিন্তু আমি তা খেতে পারলাম না। পরে আমি শহরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম,ঐ কবরে আজকেই একজন যালিম কর আদায়কারীকে দাফন করা হয়েছে। কবরের আযাবের এরূপ অবস্থা আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সময় নেককার বান্দাদের দেখিয়ে থাকেন, যেমনি তিনি কোন কোন সময় জিন অথবা ফেরেশতাকে দেখিয়ে দেন।

হযরত শা’বী (রা) থেকে বর্ণিত: একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে আরয করলো, আমি বদরের মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম একজন মানুষ মাটির নিচ থেকে বের হয়ে আসছে এবং অপর এক ব্যক্তি তাকে হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করছে। পিটুনি খেতে খেতে ঐ লোকটি আবার মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার বের হয়ে আসছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এই লোকটি হলো আবু জাহল, কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর এই শাস্তি অব্যাহত থাকবে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া কর্তৃক লিখিত ‘কিতাবুল কুবুর’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)
এই সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো : হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একদা আমি আমার সওয়ারীতে চড়ে পবিত্র মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে সফরের জিনিসপত্র বাঁধা ছিলো। পথিমধ্যে একটি কবরস্থান অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি তার কবর থেকে উঠে এলো, তার সারা দেহে আগুন জ্বলছিলো। তার ঘাড়ে একটি শিকল বাঁধা ছিলো। সে এটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। আমাকে দেখে সে বললো, “আবদুল্লাহ! আমার উপর পানি ছিটিয়ে দাও।” জানিনা সে আমাকে চিনতো কিনা, নাকি লোকাচার হিসেবে সে আমাকে “আবদুল্লাহ” নাম ধরে ডাকছিলো। এর মধ্যে অপর এক ব্যক্তি কবর থেকে বের হয়ে এসে বললো, “হে আবদুল্লাহ! এর উপর পানি ছিটিও না।” তারপর সেই ব্যক্তি তার শিকল ধরে টেনে হেঁচড়ে তাকে কবরের ভেতর নিয়ে গেলো। তখন আমি সওয়ারীর উপর চেতনা হারিয়ে ফেললাম। আর সওয়ারীটি আমাকে বয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলো। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)
হযরত উরওয়াহ (রা)ও উপরে বর্ণিত ঘটনাটি কিঞ্চিত শব্দগত পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, এই ভয়াবহ ঘটনাটির কারণে আমার মাথার চুল রাতারাতি সাদা হয়ে গিয়েছিলো। আমি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে এই ঘটনাটি জ্ঞাত করলে, তিনি মুসলমানদেরকে ঐ পথে একাকী ভ্রমণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)
হযরত আবু কুযাহা (রা) বলেন, আমি একবার একটি পানির কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যা বসরার রাস্তায় অবস্থিত ছিলো। তখন সেখানে গাধার চিৎকারের ন্যায় একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি তখন লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এ

গাধার আওয়াজ কোত্থেকে আসছে? এটা কিসের আওয়াজ? লোকেরা বললো, এক ব্যক্তি আমাদের নিকটেই বসবাস করতো। যখন তার মা তার সাথে কথা বলতেন তখন সে বলতো, তুমি গাধার মতো চেঁচাচ্ছো কেন? ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার কবর থেকে প্রত্যহ গাধার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

হযরত আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত : মদীনায় একজন লোক বাস করতেন। তাঁর বোনও মদীনার শহরতলীতে বাস করতো। তাঁর বোনটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখাশুনার জন্য প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন। একদিন তাঁর সেই বোনটি মারা গেলে তাকে দাফন করা হলো। এরপর তাঁর মনে হলো ভুলবশত তাঁর কোন একটি জিনিস কবরদিতে রয়ে গিয়েছে। সুতরাং তিনি তাঁর এক বন্ধুকে সাথে করে কবর খুঁড়ে তাঁর পড়ে যাওয়া জিনিসটি উদ্ধার করলেন। এরপর তাঁর সাথীকে বললেন, তুমি একটু সরে দাঁড়াও। আমি আমার বোনকে এক নজর ভালো করে দেখে নেই, সে কি অবস্থায় আছে। তখন তিনি দেখতে পেলেন সেই কবরের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তিনি তাড়াতাড়ি কবরটি ঠিক করে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তোর বোনকে কি অবস্থায় দেখলি? তিনি বললেন, তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবেন না। সে তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনি আমাকে বলুনতো সে কি কি কাজ করতো? মা বললেন, “সে দেরীতে এবং বিনা ওযূতে নামায পড়তো, আর প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে চুপিসারে তাদের কথাবার্তা শুনতো।” (সূত্র : ইবনে আবিদ দুনিয়া)

মারশাদ ইবনে হাওশ কর্তৃক আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো : তিনি একদিন ইউসুফ ইবনে উমরের নিকট বসা ছিলেন। তার নিকট আর একজন লোকও উপস্থিত ছিলো যার একটি গাল ছিলো লোহার পাতের মত শক্ত। ইউসুফ লোকটিকে বললো, মারসাদকেও তোমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনাটি শোনাও। লোকটি বললো, আমি তখন নওজোয়ান ছিলাম, পাপকে ততোটা ভ্রূক্ষেপ করতাম না। একবার প্লেগ মহামারী দেখা দিলে আমি ইচ্ছা করলাম সীমান্তের ওপারে চলে যাবো। তারপর ঠিক করলাম, আমি কবর খনন করবো ও কাফন চুরি করবো। একদিন মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আমি একটি কবর খনন করলাম এবং অন্য একটি কবরের মাটির সাথে হেলান দিয়ে বসলাম। এর মধ্যে একটি লাশ আনা হলো এবং একে খনন করা কবরে দাফন করা হলো। লোকজন চলে গেলে আমি দেখলাম উটের ন্যায় বিরাট আকৃতির দু’টি সাদা রঙের পাখি পশ্চিম দিক থেকে এসে

একটি কবরের শিয়রের দিকে এবং অপরটি পায়ের দিকে নামলো আর উভয়ের কবরের মাটি সরালো। তারপর একটি পাখি কবরে প্রবেশ করলো আর অপরটি কবরের দ্বারে রইলো। আমি এই অবস্থায় ভয় পেলাম না। আমি শুনতে পেলাম ঐ পাখি মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলছে, তুমি গেরুয়া রঙের পোশাক পরে গর্ব ও অহঙ্কার সহকারে কি তোমার শ্বশুরালয়ে যেতে না? মৃত ব্যক্তি বললো, আমি এখন খুবই দুর্বল। তারপর পাখিটি তাকে এমন আঘাত করলো, এতে তার কবর তেল ও পানিতে ভরে গেলো। এমনিভাবে পাখিটি তাকে তিনবার আঘাত করলো, আর প্রত্যেক বারই একই কথা বললো। প্রত্যেকবার কবরটি তেল ও পানিতে ভরে যেতো। পাখিটি এরপর মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, ওহে, এখানে বসে আছো কেন? আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত থেকে তোমাকে দূরে রাখুন। এরপর পাখিটি আমার গালে তার পাখা দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলো যে আমি মাটিতে পরে গেলাম এবং সারারাত সেখানেই সে অবস্থায় পরে রইলাম। ভোর বেলা দেখলাম, কবরটি যেমন ছিলো তেমনই আছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও ঐসব তেল ও পানি মনে হয়েছিল আসলে তা ছিলো জ্বলন্ত আগুন যেখানে মৃত ব্যক্তির দেহ জ্বলছিলো। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছেন, তার কাছে পানি ও আগুন থাকবে। ঐ আগুন হবে আসলে শীতল পানি, আর ঐ পানি হবে শিখা বিশিষ্ট আগুন।

জনৈক অসৎ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত : সে ছিলো কাফন চোর। সে কবর খুলে কাফন চুরি করতো। তখন সে দেখতে পেতো, কোন কোন মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার বিপরীত দিকে ঘুরানো। এই অবস্থা দেখে সে অনুতপ্ত ও ভীত হয়ে গেলো। এই ঘটনাটি হযরত আবু ইসহাক ফায়ারী (র)-কে জানানো হলে, তিনি চুপ রইলেন ও ইমাম আওযায়ী (র)-কে লিখিতভাবে জানালেন। উত্তরে ইমাম আওযায়ী (র) বললেন, কাফন চোরের তাওবাহ কবুল হবে যদি সে খালিস নিয়তে তাওবাহ করে এবং আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়। আর যাদের মুখ কিবলার বিপরীত দিকে ঘুরানো ছিলো তারা সুন্নাতের পরিপন্থী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলো। তাই তাদের এই অবস্থা।

অন্য একজন কাফন চোর যে তাওবাহ করেছিলো, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার জীবনে দেখা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনাটা কি? সে বললো, একবার আমি একজন মৃত ব্যক্তির কবর খুলে দেখতে পেলাম, তার সারা শরীরে পেরেক মারা

রয়েছে। একটি বড় পেরেক ছিলো তার মাথায় ও আরেকটি বড় পেরেক ছিলো তার পায়ে।

আরো একজন কাফন চোরকে তার জীবনের আশ্চর্যজনক ঘটনা কি জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেছিলো, সে একজন মৃত ব্যক্তির কবরে তার মাথার খুলি সীসায় ভর্তি অবস্থায় দেখেছিলো। অপর এক কাফন চোরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তোমার তাওবাহ করার কারণ কি? সে বলেছিলো, কবর খুঁড়লে পর সাধারণত মৃতদের মুখ কিবলার উল্টো দিকে ঘুরানো অবস্থায় দেখা যেতো। এই অবস্থা দেখে আমি তাওবাহ করে কাফন চুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। (সূত্র : কিতাবুল কুবুর)

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাসসাব সালামী (র) একজন অতি নেককার ও সত্যাবাদী লোক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার একজন লোক বাগদাদ নগরীর বাজারে জনৈক কর্মকারের নিকট দু'মাথা বিশিষ্ট ছোট ছোট কিছু পেরেক বিক্রয় করেছিলো। ঐ কর্মকার পেরেকগুলোকে নরম করতে চাইলো কিন্তু আগুন ও হাতুড়ির পিটুনীতে সেগুলো নরম হলো না। সে খুবই ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে বসে রইলো। পরে ঐ কর্মকার পেরেক বিক্রেতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এসব পেরেক তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছো? সে বললো, এগুলো আমার নিকট ছিলো। অবশেষে পীড়াপীড়ি করায় সে বললো : এসব পেরেক আমি একটি খোলা কবরের ভেতর পেয়েছি এবং এগুলোর সাথে মৃতের হাড়গোড় আটকানো ছিলো। আমি পেরেকগুলোকে হাড়গোড় থেকে খুলে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত পাথর দিয়ে মৃত ব্যক্তির হাড়গুলো ভেঙে এসব পেরেক বের করে এনেছি। হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাসসাব সালামী (র) বলেন, আমি এ পেরেকগুলো দেখেছি, সেগুলো দেখতে ছোট ও দু'মাথা বিশিষ্ট ছিলো।

হযরত আবুল হুরায়েশ (র) থেকে বর্ণিত : আমার আম্মা আমাকে বলেছেন, খলীফা আবু জাফর যখন কুফা নগরীতে পরিখা খনন করালেন, তখন লোকেরা তাদের আত্মীয় স্বজনের লাশ সেখান থেকে সরিয়ে নিলো। আমি ঐ সব মৃতদের মধ্যে একজন নওজোয়ানকে দেখতে পেলাম, সে নিজের হাত কামড়ে দিয়ে আছে।

হযরত সাখখাক ইবনে হারব (র) কর্তৃক বর্ণিত : একদা হযরত আবু দারদা (রা) কবরস্থানের মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "হে কবরবাসীরা! তোমাদের কবরের উপরের দিকে কতো শান্তি আর ভেতরে কতোই না অশান্তি বিরাজমান।

কবরের আযাব সম্পর্কে হযরত সাবিতুল বানানী (র) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন

তিনি কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর পেছন থেকে এক আওয়াজ আসলো। তিনি শুনতে পেলেন, হে সাবিত! কবরস্থানের নীরবতায় ধোঁকা খেয়ো না। কারণ এদের মধ্যে অনেক দুঃখী ও হতভাগ্য লোক রয়েছে। তিনি পেছনে ফিরে দেখলেন সেখানে কেউ নেই।
হযরত হাসান (রা) কোন এক সময়ে এক কবরস্থান দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, এখানকার মৃতদের অবস্থা আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। কারণ এদের অবস্থা বাহ্যিকভাবে নীরব ও নিথর, অথচ তাদের মধ্যে অনেকেই চরম অশান্তিতে আছে।
খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মাসলামাহ ইবনে আবদুল মালিক (র)-কে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পিতাকে কে দাফন করেছিলো? তিনি উত্তর দিলেন, একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ওলীদকে কে দাফন করেছিলো? মাসলামাহ ইবনে আবদুল মালিক বললেন, আমার আর এক মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তখন বললেন, এ বিষয়ে আমি যা জানতে পেরেছি, আমি তোমাকে তাই বলছি। যখন তোমার পিতাকে ও ওলীদকে দাফন করা হয়, আর তাদের কাফনের গিরা খোলা হয় তখন তাদের মুখ উল্টোদিকে ঘুরানো ছিলো। হে মাসলামাহ! শোন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে কবরে রাখার পর, তুমি আমার মুখ খুলে দেখবে তাদের মতো আমার মুখও কিবলার উল্টো দিকে ঘুরানো, নাকি আমাকে ওদের অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। মাসলামাহ (র) বলেন, আমি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর লাশ কবরে রাখার পর তাঁর মুখ দেখেছিলাম, তা যেমনটি কিবলামুখী করে রাখা হয়েছিল, ঠিক তেমনি আছে।
আগেরকার দিনের জনৈক আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর একটি মেয়ে মারা গেলে তিনি তার লাশকে কিবলামুখী করে নিজ হাতে কবরে রাখলেন। পরে সেই কবরের ইট ঠিক করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, লাশের মুখ কিবলার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে। এই অবস্থা দেখে তিনি মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন, মেয়েটি তাঁকে বলছে আব্বাজান, আপনি আমার মুখ কিবলার উল্টো দিকে ফিরা অবস্থায় দেখে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। সাধারণত আমার আশেপাশের সকল লাশই কিবলার বিপরীতমুখী। এর কারণ হলো, যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত অবস্থায় মারা যায়, মৃত্যুর পর তাদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা হয়ে থাকে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত : ওলীদ ইবনে আবদুল মালিককে যাঁরা কবরে নামিয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। তিনি তাকে যে অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, এতে তাঁর ছেলে বলেছিলেন, “কাবার রবের কসম, আমার পিতা এখন কবরের মধ্যে ভালো অবস্থায় আছেন।” হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এই কথা শুনে বলেছিলেন, “কাবার রবের কসম! তোমার পিতার দুনিয়ার জীবনও সুখের এবং শান্তির ছিলো।” এ ঘটনা থেকে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন ইয়াযীদ ইবনে মুহল্লাবকে ইরাকের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন, তখন তাঁকে উপদেশস্বরূপ বলেছিলেন, “আল্লাহকে ভয় করে চলবে। তাহলে মৃত্যুর পর কবরে তুমি শান্তিতে থাকবে। এই প্রসঙ্গে তিনি মালিকের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাকে দাফনের পর ভালো অবস্থায় দেখা গিয়েছিলো।”
হযরত আবদুল হামীদ (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট কিছু লোক এসে জানালো- তাঁরা হজ্জে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় “যুল সাফফাহ” নামক স্থানে তাঁদের একজন সাথী মারা যান। তাঁরা তাঁর দাফনের জন্য কবর খনন করেন। যখন কবর তৈরি হলো তখন একটি কালো রঙের সাপ এসে কবরে ঢুকে পড়লো। এই অবস্থায় তাঁরা সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় আর একটি কবর খনন করেন। সেখানেও ঐ সাপটি চলে এলো। তাঁরা তৃতীয় জায়গায় আর একটি কবর খনন করলেন। সেখানেও সাপটি এসে হাযির হলো। এই অবস্থায় তাঁরা তখন কি করবেন! তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর শরণাপন্ন হলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, এটা তার চুরি করার পরিণাম। যাও, তাকে যে কোন একটি কবরে রেখে দাও। আল্লাহর কসম, দুনিয়ার যে কোন জায়গায় তার কবর খনন করা হোক না কেন, ঐ সাপটি সেখানে যাবেই। অবশেষে তাঁরা ঐ লোকটিকে একটি কবরে দাফন করে দিলেন। হজ্জের শেষে তাঁরা তার সামান-পত্র তার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন এবং তার বিধবা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন- “তোমার স্বামী কি কাজ করতো? তার স্ত্রী বললো, “সে খাদ্য শস্যের ব্যবসা করতো। খাদ্য শস্যের মধ্য থেকে পরিবারের জন্য প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য সরিয়ে নিতো এবং সে পরিমাণ অন্য কোন জিনিস শস্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতো।
হযরত আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত : তাঁকে এক মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়ার জন্য ডাকা হলো। তিনি যখন মৃত ব্যক্তির মুখ থেকে চাদর সরালেন, তখন দেখতে

পেলেন, তার ঘাড়ে একটি বড় আকারের সাপ জড়িয়ে আছে। অবশেষে তিনি তাকে গোসল না দিয়েই চলে এলেন। লোকেরা তখন বলতেছিলো- "ঐ ব্যক্তি নাকি মহান সাহাবাগণকে গালি-গালাজ করতো।" তাই তার এই পরিণতি।

বসরাবাসী জনৈক কবর খননকারী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন একটি কবর খুঁড়লেন এবং পরে ঐ কবরের নিকট ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন তাঁর নিকট দু'জন মহিলা আসলেন। তন্মধ্যে একজন মহিলা তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর ওয়াস্তে ঐ মহিলার লাশটি আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাকে আমার পাশে দাফন করো না। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। ইতিমধ্যে এই কবরের নিকট একজন মহিলার জানাযা আনা হলো। তখন তিনি ঐ মহিলার লাশটিকে এ কবরে দাফন না করে অন্য কবরে দাফন করতে বললেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে আবার সেই দুইজন মহিলা তাঁকে দেখা দিলেন। একজন মহিলা তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমার নিকট থেকে দীর্ঘস্থায়ী অশান্তি সরিয়ে দিয়েছো। তিনি বললেন, এই মহিলা কেন আপনার মতো কোন কথা বলছেন না? তিনি বললেন, এই মহিলা মৃত্যুর পূর্বে প্রয়োজনীয় কোন অসিয়ত ও উপদেশ না দিয়েই মারা গিয়েছিলেন। এই জন্য তিনি কিয়ামত পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারবেন না। (কবরের এই সব বিষয় সম্পর্কে যাঁরা জানতে আগ্রহী তাঁরা ইবনে আবিদ দুনিয়ার 'কিতাবুল মানামাত' এবং কাইরাওয়ানীর 'কিতাবুল বুস্তান' পাঠ করতে পারেন।)

আলমে বরযখের ঘটনাবলীর চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী দুনিয়াতেও ঘটতে দেখা যায়। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হতেন ও কথা বলতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ)-এর কথা শুনতে পেতেন। অথচ তাঁর আশেপাশের লোকজন তাঁকে দেখতে পেতেন না এবং তাঁর কথাও শুনতে পেতেন না। সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থা ছিলো ঠিক এ রকম। কোন কোন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঘণ্টা ধ্বনির শব্দের মতো ওহী আসতো, যা তিনি ছাড়া আর কেউ শুনতে পেতেন না। যেমন জিনেরা আমাদের মধ্যে অবস্থান করে ও উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলে, কিন্তু আমরা তাদের কথাবার্তা শুনতে পাই না। কোন কোন সময় ফেরেশতারা কাফিরদেরকে চাবুক মেরেছেন সেজন্য তারা চিৎকারও করতো। মুসলমানেরা নিকট

থেকেও ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেতেন না, তাঁদের কথাও শুনতে পেতেন না। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে দুনিয়ার অনেক বিষয় লুকিয়ে রেখেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিতেন অথচ উপস্থিত লোকজন তা শুনতে পেতেন না। প্রকৃতপক্ষে, যিনি আল্লাহর খাসবান্দা এবং তাঁর একচ্ছত্র কুদরতে বিশ্বাস করেন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর অপার করুণায় ঐসব ঘটনাবলী যা সাধারণ মানুষ দেখতে বা বুঝতে পারে না তা তাঁকে অবহিত করেন। এটা কি কেউ অবিশ্বাস করতে পারে?
সাধারণ মানুষের দর্শন ও শ্রবণ শক্তি কবরের আযাব বা আরাম প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করতে পারে না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর খাস বান্দা কবরের ঐসব ঘটনাবলী বুঝতে পারেন ও শুনতে পারেন। কেউ কেউ কবরের ঐসব দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে যান, এমনকি মৃত্যুবরণও করে থাকেন। এসব ঘটনাবলীকে রহস্যগত কারণে আল্লাহ পাক যে আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন তা আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। বরযখী জীবনে যখন এই সব রহস্যের অবসান ঘটবে তখন সবকিছু আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবো। এছাড়া একজন মানুষ কোন মৃত ব্যক্তির চোখ থেকে পারদ বা বুক থেকে সর্বস্ব তুলে অতিসত্বর ঐগুলো স্বস্থানে রেখে দিতে পারে, তাহলে ফেরেশতারা তো এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহর কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। তিনি যে কোন মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা পুরস্কৃত করতে পারেন।
বরযখী জীবনের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা সম্পর্কে কোন অনুমান করা মূর্খতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর রাসূল এটাকে অস্বীকার করা, আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতাকে অস্বীকার করারই শামিল। মানুষ একটি কবরকে প্রশস্ত বা সংকীর্ণ রূপে তৈরি করে, একটি লাশ সেখানে আড়াল করে রাখতে পারে বা নাও রাখতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। একজন নেককার বান্দার ক্ষেত্রে একটি কবর দৃশ্যত দু'আড়াই হাত গভীর দেখা গেলেও সেটা অনেক প্রশস্ত, সুগন্ধিযুক্ত ও আলোময় হতে পারে। শুধু তাই নয়, বদকার ব্যক্তিদের কবর অতিশয় সংকীর্ণ, দুর্গন্ধময় ও অন্ধকার হতে পারে। তবে কবরের এই রূপ অবস্থা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি বা অনুভব করা সম্ভবপর নয়।

দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সেসব প্রত্যক্ষ করার শক্তি ও জ্ঞান দিয়েছেন। তবে আখিরাতের ঘটনাবলীর উপর পর্দা টেনে দিয়েছেন যাতে মানুষ ঐসব বিষয় না দেখেও বিশ্বাস করে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। বান্দার রহস্যের এ পর্দা যখন তুলে নেয়া হয়, তখন তার রূহ সব কিছুই দেখতে পায়। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির লাশ মানুষের সামনে রাখা থাকলেও ফেরেশতারা এসে মৃত ব্যক্তিকে যেসব প্রশ্ন করেন, মৃত ব্যক্তি ফেরেশতাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। তবে জীবিত মানুষ ফেরেশতাদেরকে দেখতে পায় না ও তাদের কথাও শুনতে পায় না। সেই অবস্থায় একজন মৃত ব্যক্তি যে আযাব বা আরাম ভোগ করেন মানুষের পক্ষে তা জানা বা অনুভব করা সম্ভব নয়।

এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, দুজন লোক একই বিছানায় শুয়ে থাকার পর একজন ঘুমিয়ে পড়ে অপরজন জেগে থাকে। অতঃপর ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে তাকে প্রহার করা হচ্ছে, সে প্রহারের ব্যথাও অনুভব করছে কিন্তু তার পাশে জাগ্রত ব্যক্তি ঐসবের কোন কিছুই বুঝতে বা জানতে পারে না। এরূপ আঘাত ও কষ্টের চিহ্ন দেহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, যদিও রূহও সেই কষ্ট অনুভব করে। এটা কতোই না মূর্খতা ও মূঢ়তার বিষয় যে, কবরের পাথরের দেয়াল ভেদ করে মৃত ব্যক্তির কাছে ফেরেশতাদের উপস্থিতিকে এক শ্রেণীর লোক অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের জন্য সবকিছু অতিসহজ করে দিয়েছেন- যেমন পাখিরা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। তাই কোন স্থুলবস্তু রূহের কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ধরনের আকীদা পোষণ করা মহান রাসূলগণকে অস্বীকার করারই শামিল।

জড় পদার্থেও অনুভূতি ও সচেতনতা বিদ্যমান থাকে। ফাঁসি কাষ্টে ঝুলন্ত কোন ব্যক্তি অথবা সমুদ্রে ডুবন্ত কোন ব্যক্তি, আগুনে ভস্মীভূত কোন দেহ অথবা অন্য যে কোন ধরনের লাশের মধ্যে রূহকে ফিরিয়ে আনা আল্লাহ পাকের জন্য কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। কেননা রূহকে দেহে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এটা সে ধরনের কোন জ্ঞান নয় যা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। একজন বেহুঁশ ব্যক্তি অথবা একজন মৃগী রোগী অথবা একজন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি যখন জীবিত থাকে তখন তার রূহ তার দেহের মধ্যেই থাকে। কিন্তু সেই অবস্থায় তার জীবনী শক্তির স্বাভাবিক অবস্থা কেউ অনুভব করতে পারে না। যেসব লাশের অংশগুলো পৃথক হয়ে বিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাদের চেতনা বা অনুভূতি সম্পর্কে আমরা কোন কিছুই জ্ঞাত

নই। মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মৃত ব্যক্তির নিশ্চিহ্ন অঙ্গগুলোর মধ্যে রূহকে ফিরিয়ে আনা মোটেই কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। সেই মৃত ব্যক্তির কোন অংশ যদি মাশরিকে আর কোন অংশ মাগরিবে থাকে, তবুও ঐ অঙ্গগুলোর মধ্যে আযাব বা আরাম দেয়া আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।আল্লাহ তা'আলার জড়বস্তুর মধ্যেও অনুভূতি এবং সম্যক উপলব্ধি করার শক্তি দান করেছেন যা দ্বারা তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। আল্লাহর ভয়ে পাহাড়ের উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পরে, পাহাড় ও বৃক্ষরাজি তাঁকে সিজদাহ করে। পাথরের টুকরো, বৃক্ষরাজি এবং পানির বিন্দুরাশি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণায় রত। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর এ সৃষ্ট জগতে এমন কিছুই নেই যা তাঁর প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৪৪)

আল্লাহর এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ যদি এদের স্রষ্টার কেবল অস্তিত্বকে প্রমাণ করা বুঝায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা কখনো বলতেন না, "তোমরা তাসবীহ পাঠ ও মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পারো না।" কেননা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, সৃষ্টি দ্বারা স্রষ্টাকে জানা যায়। প্রতিটি সৃষ্টিই পরোক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "আমি পর্বতমালাকে তার [দাউদ (আ)-এর] অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো।" (সূরা সোয়াদ : আয়াত-১৮)

প্রকাশ থাকে যে, আপন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করাই কেবল উক্ত দু'টি সময়ের অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং হে পক্ষীসকল, তোমরাও। আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে দিয়েছিলাম।" (সূরা সাবা : আয়াত-১০)

উল্লেখ্য যে, স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি পরোক্ষভাবে সম্মান প্রদর্শন বা তাসবীহ পাঠ হযরত দাউদ (আ)-এর কোন নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ ব্যাপার ছিলো না। ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে বলে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা, ধ্বনি প্রতিধ্বনির সাথে সংশ্লিষ্ট।

কেননা, যে কোন শব্দেরই প্রতিধ্বনি হয়ে থাকে। কাজেই হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে এ বিষয়ে সম্পর্কিত করার মধ্যে কোন নতুন কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "আপনি কি দেখেন না, সবই আল্লাহকে সিজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে- সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না।। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (সূরা হজ্জ : আয়াত-১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "আপনি কি দেখেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড্ডীন পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করত আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এছাড়া প্রত্যেকেই তার যথার্থ ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার নিয়ম কানুন জ্ঞাত আছে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরা আন-নূর : আয়াত-৪১)

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, এই সালাত ও তাসবীহর গূঢ় রহস্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন, যদিও এই বিষয়টি মূর্খেরা অথবা নবীদের উপর মিথ্যা আরোপকারীরা অস্বীকার করে।

আল্লাহ তা'আলা পাথর সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন কোন পাথরও আল্লাহর ভয়ে নিজ স্থান থেকে গড়িয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মতো বা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে, যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর সেটা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়তে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৭৪)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন যে, "যমীন ও আসমান তাঁর (আল্লাহর) কথা শোনে ও মানে। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তারাও আল্লাহর কথা শুনেছে ও তার সঠিক উত্তর দিয়েছে।"

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিলো ধূম্রপুঞ্জ, অতঃপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আসো, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। অতঃপর তিনি আকাশরাজিকে দু'দিনে সাত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক

আকাশে তাঁর আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" (সূরা হামীম সিজদা : আয়াত-১১,১২)

কোন কোন সাহাবী খানা খাওয়ার সময় খাবারের তাসবীহ পাঠ শুনতে পেতেন। তাঁরা মসজিদে শুকনো কাষ্ঠখণ্ডের ক্রন্দনও শুনতে পেয়েছিলেন। সুতরাং যখন এসব জড়বস্তুর মধ্যেও চেতনা ও অনুভূতি থাকে, তাহলে যেসব দেহের মধ্যে এককালে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত রূহ বিদ্যমান ছিলো, সেগুলোর মধ্যে আরো বেশি চেতনা বা অনুভূতি ফিরে আসাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়ায় রূহকে সে সমস্ত দেহের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন, যে সমস্ত দেহ থেকে তাদেরকে সাময়িকভাবে কবয করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত দেহ জীবিত হয়ে চলাফেরা করেছে, পানাহার করেছে, বিয়ে-শাদী করেছে এবং তারা দ্রব্যাদি জন্ম দিয়েছে আর মানুষ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষও করেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তাঁরা ছিলো সংখ্যায় হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর আবার তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৪৩)

"আপনি কি সে লোককে দেখেননি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলো যার ঘর বাড়ি সব ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বললো, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন এবং বললেন, কতকাল তুমি এভাবে ছিলে? সে বললো, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা নয় বরং তুমিতো একশ বছর অবস্থান করেছ। এবার তুমি চেয়ে দেখো নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে- সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখো নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখো যে, আমি এগুলো কেমন করে জুড়ে দেই এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। অতঃপর যখন তার নিকট এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন সে বলে উঠলো- আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৫৯)

এই প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের ঐ নিহত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাকে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় জীবিত করেছিলেন এবং সে তার হত্যাকারীর নাম বলে দেয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আবার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করছিলে, যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিলো আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আল্লাহ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা চিন্তা করো।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৭২-৭৩)

ঐসব লোকের কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিল, "আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখা পর্যন্ত কখনো তাঁকে বিশ্বাস করবো না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মৃত্যু দান করেছিলেন এবং আবার তাদের জীবিত করেছিলেন।" এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। "আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে দেখতে পাবো। বস্তুতঃ তোমাদেরকে পাকড়াও করলো বিদ্যুৎ। আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-৫৫-৫৬)

এ প্রসঙ্গে আসহাবে কাহাফের ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দীর্ঘদিন ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, "আপনি কি মনে করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিলো। যখন যুবকরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তারা দুআ করে, হে পালনকর্তা, আমাদের আমাদের আপনার কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। তারপর আমি কয়েক বছরের জন্য গুহায় তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরায় জীবিত করি, একথা জানার জন্য যে, দু'দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল পরিপূর্ণভাবে নির্ণয় করতে পারে। আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিলো কয়েকজন যুবক তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তখন তারা বললো, আমাদের পালনকর্তা, আসমান ও

যমীনের পালনকর্তা, আমরা কখনো তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করবো না, যদি করি তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এরা আমাদের স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দয়া প্রদর্শন করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ-কর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। আপনি সূর্যকে দেখবেন, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনো তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী বা সাহায্যকারী পাবেন না। আপনি মনে করবেন তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিলো নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিলো সামনের পা দু'টো গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতেন তবে পিছন ফিরে পলায়ন করতেন এবং তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বললো, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বললো, তোমাদের পালনকর্তাই বলতে পারবেন, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ করো, সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য, সে যেন সতর্কতার সাথে কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। আর যদি তারা তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। এমনিভাবে আমি তাদের খবর মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন অনেকে বললো, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ করো।

তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো, তারা বললো, আমরা অবশ্যই তাদের পার্শ্বে মসজিদ তৈরি করবো।" (সূরা কাহাফ : আয়াত-৯-২১)

হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর চারটি পাখির ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "যখন হযরত ইব্রাহীম (আ) বললেন, হে আমার পালন কর্তা, আমাকে দেখান কেমন করে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? হযরত ইব্রাহীম (আ) বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি এজন্যে দেখতে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। তিনি বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে আনো। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও তারপর সেগুলোকে ডাকো, তোমার নিকট এরা দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানী।" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২৬০)

উপরে বর্ণিত মৃত্যুর ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে পুনরায় পূর্ণ জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তার বিস্ময়কর কুদরতের কাছে এটা অসম্ভব নয় যে, মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে এক ধরনের জীবন দান করবেন এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অতঃপর তাদের আমল অনুযায়ী তাদেরকে কোন না কোনভাবে শাস্তি অথবা পুরস্কার প্রদান করবেন। এটা আল্লাহর কাছে কঠিন কিছু নয়। আল্লাহর কুদরত কাফির ও মিথ্যাবাদী ছাড়া অন্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কবরের আযাব ও আরাম বলতে বরযখী জীবনের আযাব ও আরামকে বুঝায়। বরযখ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল মুমিনূন : আয়াত-১০০)

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময় বা অবস্থার নাম হলো বরযখ। সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটাকে কবরের আযাব বা আরাম এবং জান্নাতের বাগান বা দোযখের গর্ত বলা হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত ব্যক্তি, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি এবং হিংস্র পশু বা পাখি কর্তৃক ভক্ষণ করা মানুষকেও তার আমল অনুযায়ী বরযখের আযাব বা আরাম প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে আযাব বা আরামের কার্যকারণ এবং এর অবস্থান বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে কোন এক ব্যক্তি ধারণা করেছিলো, যদি তার লাশ পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে তার কিছু অংশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয় এবং কিছু অংশ প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে আযাব থেকে সে বেঁচে যাবে। সুতরাং সে ব্যক্তি তার ছেলেদের এরূপ অসিয়ত করে গেলো এবং মৃত্যুর পর ছেলেরা তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করলো। তারপর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে সমুদ্র ও ভূভাগ ঐ ব্যক্তির দেহের যাবতীয় বিক্ষিপ্ত অংশ একত্রিত করে দিলো এবং আল্লাহ পাক তাকে দাঁড়াবার আদেশ করলেন। সে তখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরকম করলে কেন? সে উত্তর দিল, হে রব! আপনি তো ভালো করেই জানেন, আমি আপনার ভয়েই এরকম করেছিলাম। অবশেষে আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন। তাহলে দেখা গেলো বিক্ষিপ্ত এবং বাহ্যিক নাম নিশানা বিহীন দেহের অণু-পরমাণুর উপরও বরযখের আযাব বা আরাম হয়ে থাকে। যদি কোন পাপী ব্যক্তির লাশকে শূন্যে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলেও সে তার আমল অনুযায়ী বরযখের আযাব ভোগ করবে। আর যদি কোন নেককার ব্যক্তির লাশকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে সে তার আমল অনুযায়ী বরযখে শান্তি লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে দেন। আর পাপী ব্যক্তির জন্য আগুনকে অতিশয় উষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক করে দেন। দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ ও উপাদান তাদের স্রষ্টার আজ্ঞাধীন। তারা কখনো আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে না। বরং আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সে সবের ব্যবহার করেন। আর কেউ যদি এ কথা না মানে, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রুবুবিয়াতকে অস্বীকার করারই শামিল।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য মৃত্যুর পর দু'টো জীবন নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে সৎকর্মের প্রতিদান ও অসৎকর্মের শাস্তি প্রদান করা হয়। বরযখের প্রথম জীবন শুরু হয় যখন মানুষের রূহ দেহ থেকে পৃথক হয়ে আযাব বা আরাম ভোগ করতে শুরু করে। আরেক জীবন শুরু হবে যখন রোযে কিয়ামতে, মানুষ আল্লাহর নির্দেশে তাদের কবর থেকে উঠে আসবে এবং হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই একটি সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে, "ঈমানের এটাও একটি অংশ যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে।" কেননা প্রথম বরযখী জীবনকে তো কেউই অস্বীকার করতে পারে না, যদিও কেউ কেউ এর মধ্যে প্রতিদান, শান্তি এবং আযাব বা আরামকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তা'আলা

মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন-এর বর্ণনা সূরা আল মু'মিনূন, সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা কিয়ামাহ, সূরা মুতাফফিফীন আর সূরা ফজরে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা অতিশয় বিচক্ষণ ও সুবিচারক। তাই তিনি নেককার ও বদকারদের পৃথক পৃথক আবাসস্থল তৈরি করে রেখেছেন। সেখানে তারা রোযে হাশরের বিচারের পর প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, "এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, আর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা আল মুমিনূন : আয়াত-১৫-১৬)। পবিত্র কুরআনে আরো উল্লেখ আছে, "তারা বলতো, আমরা যখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি পুনরুত্থিত হবো আমাদের পূর্ব পুরুষগণসহ। বলুন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ সকলেই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।" (সূরা ওয়াকিয়াহ : আয়াত-৪৭-৫০)

যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। এটা কাউকে করবে নিচু, কাউকে করবে সমুন্নত।" (সূরা ওয়াকিয়াহ : আয়াত-১-৩)

"আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারণ করেছি এবং আমি অক্ষম নই এ ব্যাপারে যে, তোমাদের মতো লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দেই যা তোমরা জানো না। তোমরা অবগত হয়েছো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন করো না কেন? (সূরা ওয়াকিয়াহ : আয়াত-৬০-৬২)

কিয়ামত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : "আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়- মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করবো না? পরন্তু আমি তার অঙ্গুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। বরং মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবনেও ধৃষ্টতা দেখাতে চায়। সে প্রশ্ন করে, কিয়ামত দিবস কবে? যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আপনার পালন কর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।" (সূরা আল-কিয়ামাহ : আয়াত-১-১২)

"তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। সেই মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বপালনকর্তার সামনে। এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। আপনি কি জানেন সিজ্জীন কী? এটা একটি লিপিবদ্ধ কিতাব।" (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ৪-৯)

“নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে। আপনি কি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? এটাও একটি সুলিখিত কিতাব।” (সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ১৮-২০)

“কখনো নয় পৃথিবীকে যখন ক্রমাগত ছিন্ন ভিন্ন করে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে, এবং আপনার পালনকর্তা আত্মপ্রকাশ করবেন এমতাবস্থায় ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে ও জাহান্নামকে সেদিন সর্বসম্মুখে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে, কিন্তু তখন তার বোধ শক্তি জাগ্রত হওয়ায় কি লাভ হবে? সে বলবে, হায়, আমি যদি এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। সেদিনের শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দেবে না এবং তার বন্ধনের মতো বন্ধন কেউ দেবে না। হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।” (সূরা আলফজর : আয়াত ২১-৩০)

“আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। তাই আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই এতে প্রবেশ করবে, যে মিথ্যা আরোপ করে ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ পথকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার উপর কারো কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না মা মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।” (সূরা আল লাইল : আয়াত ১৩-২১)

“আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে, অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচ থেকে নিচে কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের রয়েছে অশেষ পুরস্কার। অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছো কিয়ামতকে? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?” (সূরা ত্বীন : আয়াত ৪-৮)

“আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে থেকে যেসব লোক কুফুরী করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব কিছু তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।” (সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ৬-৮)

“পৃথিবী যখন তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।” (সূরা যিলযাল : আয়াত ১-৯)

“সেকি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে, অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।”(সূরা আদিয়াত : আয়াত ৯-১১)

“যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মতো। অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন যাপন করবে আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়ায়। আপনি কি জানেন তা কি? তা প্রজ্বলিত অগ্নি।” (সূরা আল কারিয়াহ : আয়াত ৪-১১)

আল্লাহর বিচক্ষণতা ও সুবিচারের শর্ত এই যে, তিনি সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীলদের তাদের কর্মের প্রতিদানের জন্য দু’টি গ্রহ তৈরি করেছেন। কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি প্রতিফল মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানের পর হাশর ময়দানে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা’আলার পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন : “প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন জিনিস নয়।” (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮৫)

আল্লাহ তা’আলার সুবিচার, আসমায়ে হুসনা আর পবিত্র কামালিয়াতের এটাই চাহিদা যে, তিনি তাঁর বন্ধুদের দেহ ও রূহকে শান্তিতে রাখবেন। আর দুশমনদের দেহ ও রূহকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কারণেই আল্লাহর অনুগতদের দেহ ও রূহ যথাযোগ্য নি’আমত ও আরাম দেওয়া হয়। আর অবাধ্যদের দেহ ও রূহকে যথাযোগ্য শাস্তি ও কষ্ট দেওয়া হয়। যেহেতু, দুনিয়া কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষাস্থল, প্রতিদানের স্থল নয়, তাই এখানে প্রতিদানের ফল প্রকাশিত হয়না। অবশ্য বরযখ হচ্ছে নেক আমলের প্রতিদান ভোগ করার প্রথম আবাসস্থল। তবে প্রাথমিক আবাসস্থল হিসেবে সেখানে নেক আমলের প্রতিদান ও বদ আমলের প্রতিফল প্রকাশ পায়। বরযখী

জীবনে মানুষের এটাই কাম্য। তবে কিয়ামতের দিন যার যেটা প্রাপ্য তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝা গেলো যে, বরযখের আযাব বা আরাম প্রমাণিত। যেমন একটি হাদীসে আছে, নেককার কবরবাসীর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর তাঁর কাছে বেহেশতের আরাম ও নি'আমত পৌঁছতে থাকে। আর বদকার কবরবাসীদের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং এর উত্তাপ ও অশান্তি সে ভোগ করে। ঐসব ব্যাপার মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধির সীমা-পরিসীমার বাইরে। তবুও বিশেষ বিশেষ নেককার বান্দা সে সম্পর্কে অবহিত হন যদিও এর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে তাঁরা অক্ষম।

কোন জিনিসের অস্তিত্ব সেটার ব্যাখ্যা বা উপলব্ধির উপর নির্ভর করে না। আসলে মানুষ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না। মৃত্যুর পর বরযখ জীবনের প্রতিক্রিয়া দ্রুত প্রকাশ পায়। দুনিয়া, বরযখী ও আখিরাতের অবস্থাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিকমতের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল করে রেখেছেন।

[সপ্তম অধ্যায়, রূহের রহস্য]

তৃতীয় মঞ্জিল

পরকালযাত্রার তৃতীয় মঞ্জিল হলো, হাশর তথা কিয়ামত।

হাদীস শরীফে এসেছে, হাশরের একটি দিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কাফেরদের জন্যে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অতি দীর্ঘ একটি দিন। পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্যে এটি হবে কয়েক মুহূর্তের সমান।

হাদীস শরীফে এ কথাও এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন হবে ফজরের দুই রাক্আত সুন্নত আদায়ের সমপরিমাণ। আর সাইয়্যেদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদি. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত নামায হলো ফজরের দুই রাক্আত সুন্নত। কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, সূর্যের সাতটি চোখ রয়েছে। পৃথিবীতে তার একটি মাত্র চোখ খোলা হয়েছে। কিয়ামতের দিন তার সাত চোখের সবক'টিই খোলা হবে। ওই সময়টি হবে 'চাচা, আপনা জান বাঁচা'-এর সময়। প্রতিটি ব্যক্তি তার গুনাহের সমপরিমাণ ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কেউ থাকবে হাঁটু পরিমাণ ঘামে নিমজ্জিত। কারো হবে পায়ের গোড়ালি সমান। কারো ঘামের বন্যা হবে গলা পরিমাণ। শুধু ঘাম-ই হবে, এমন নয়। বরং ওই ব্যক্তি ঘামের তপ্ত পানিতে জ্বলতে থাকবে। আল্লাহর

কতিপয় বান্দা থেকে এতো অল্প পরিমাণ ঘাম বেরোবে যে, মনে হবে, সে বুঝি প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করেছে।
সেদিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো ছায়া থাকবে না। আল্লাহর এই আরশের ছায়াতলে সাত ধরনের মানুষ আশ্রয় পাবেন। একজন হলেন, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। দ্বিতীয় জন হলেন, ওই যুবক যে যৌবনে আল্লাহর ইবাদত করেছে। তৃতীয়জন হলেন ওই ব্যক্তি যার মন সবসময় মসজিদের সঙ্গে লেগে ছিলো। চতুর্থজন হলেন ওই ব্যক্তি যার ভালোবাসা ছিলো আল্লাহকেন্দ্রিক। এর ভিত্তিতেই সে অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়তো এবং এর ভিত্তিতেই সম্পর্ক ভাঙতো। পঞ্চমজন হলেন ওই ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের রূপসী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে আর ওই ব্যক্তি এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, আল্লাহর ভয় আমাকে নিষেধ করছে। ষষ্ঠজন হলেন ওই ব্যক্তি যে এতোটা গোপনে সদকা করে যে, তার এক হাতের দানের কথা অন্য হাত পর্যন্ত জানে না। আর সপ্তমজন হলেন ওই ব্যক্তি যে নিভৃতে আল্লাহর যিকির করে এবং দু'চোখের তপ্ত অশ্রু বিসর্জন করে।
এ দিন যতোক্ষণ পর্যন্ত চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নিজ স্থান থেকে একটুও নড়তে পারবে না। প্রথম প্রশ্নটি হলো, তুমি তোমার জীবন কোন কোন কাজে ব্যয় করেছো? দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে, তুমি তোমার দেহের বল কোথায় প্রয়োগ করেছো? তৃতীয় প্রশ্ন হবে, তুমি তোমার ইলমের ওপর কী পরিমাণ আমল করেছো? আর সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, তুমি কোন পথে সম্পদ উপার্জন করেছো এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছো?

চতুর্থ মঞ্জিল

চতুর্থ মঞ্জিল হলো, মীযান। পরকাল যাত্রার যেই মুহূর্তগুলোতে মানুষ একান্ত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, অন্যদের দিকে তাকানোর ফুরসতও পাবে না, সেই মুহূর্তগুলোর একটি হলো, মীযান। এ সময় প্রত্যেক মানুষই এ নিয়ে আতঙ্কিত থাকবে যে, আমার নেক আমলের পাল্লা ভারী হলো নাকি বদ আমলের পাল্লা?

পঞ্চম মঞ্জিল

পরকালযাত্রার পঞ্চম ও সর্বশেষ মঞ্জিল হলো, পুলসিরাত। এটি এমন এক পুল, যা পশমের চেয়েও চিকন ও তরবারির চেয়েও বেশি ধারালো হবে। প্রত্যেক মানুষকে এটি পেরোতে হবে। পুলটির অবস্থান ঘোর অন্ধকারের ভেতর। ঈমানদার ব্যক্তি যখন এটি পার হবেন তখন তার কাছে ঈমানের আলো থাকবে। পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তির কাছে কোনো আলো থাকবে না। সে ঈমানদারকে বলবে, ভাই, আমাকেও তোমার আলো থেকে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ দাও। সে বলবেন, না, এই আলো পৃথিবীতে পাওয়া যেতো। এরপর ঈমানদার ও কাফেরের মাঝখানে একটি দেয়াল বানিয়ে দেওয়া হবে। যার কারণে সেই কাফের নিকষ অন্ধকারে পড়ে যাবে।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে তার গুনাহের আকৃতিতে দাঁড় করানো হবে। তখন কারো চেহারা হবে আলোকিত আর কারো হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মৃতদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা

স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ যদি কারও ভাগ্যে জুটে যায়, তাহলে তো সে সৌভাগ্যশালী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

"যদি কেউ স্বপ্নযোগে আমার দর্শন লাভ করে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই আমার দর্শন লাভ করেছে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন— আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম। দেখলাম যে তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। আমি বললাম— ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার কী অপরাধ? আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন— তুমি কি রোজা অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করনি? আমি বললাম— আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলছি, আমি রোজা রাখা অবস্থায় আর কখনও নিজের স্ত্রীকে চুম্বন করব না।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন— হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তাকে স্বপ্নে দেখতে আমার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রায় এক বছর পর তাকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। দেখলাম যে তিনি নিজের কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলছেন— এখন আমি অবসর হয়েছি। যদি আমি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে না আসতাম, তাহলে আমার সিংহাসন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাকে তার পিতা হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন— "আজ রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। আমি তাকে বললাম যে, আপনার উম্মতের কাছ থেকে আমি ভালো কিছু পাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, তাদের জন্য দোয়া কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, আমি দোয়াতে বললাম— হে আল্লাহ! তাদের পরিবর্তে আমাকে এমন সব লোক দান করুন যারা তাদের তুলনায় উত্তম। আর আমার বিনিময়ে তাদেরকে আমার চেয়ে খারাপ লোক প্রদান করুন। হযরত হাসানের (রাঃ) কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করে তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার পরই ইবনে মুলজিম নামক এক দুষ্ট লোক তাকে আহত করে।"

একজন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়েছি। আমি আবেদন করলাম যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গুনাহ ক্ষমার জন্য দোয়া করুন। তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম— ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির তার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে শুনেছেন যে, আপনার কাছে কখনও এমন কোনো জিনিস চাওয়া হয়নি যা আপনি দিতে 'না' বলেছেন। ইহা শুনে তিনি আমার দিকে ফিরলেন এবং আমার গুনাহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন— আমার ও আবু লাহাবের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। সে আমার সাথি ছিল। সে মারা যাওয়ার পর আল্লাহ পাক কুরআন পাকে তার অবস্থার কথা শোনালেন। আমি তাহার জন্য খুব দুঃখিত হলাম। তাহার অবস্থা সম্পর্কে মনে নানা কথা জাগ্রত হচ্ছিল। আমি তাকে স্বপ্নে দেখার জন্য এক বছর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করছিলাম। একরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে সে আগুনে প্রজ্বলিত হচ্ছে। আমি তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল যে সে দোজখের আজাবে পতিত হয়েছে। তার ওপর আপতিত আজাব কখনও হালকা হয় না। কখনও একটু স্বস্তিও পায় না। তবে শুধু সোমবার রাতে তার আজাব হালকা করা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইহা কেন? সে বলল যে, ওই রাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। অর্থাৎ জন্মলাভ করেছিলেন। এক বাঁদি এসে আমাকে সুসংবাদ প্রদান করল যে, আমেনা এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ

করিয়েছে। আমি খুশি হয়ে বাঁদিটিকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। আল্লাহ পাক আমাকে এই কাজের বিনিময়ে প্রদান করেছেন। প্রতি সোমবারে আমার ওপর থেকে আজাব হালকা করে দিয়েছেন।

আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ (রাঃ) বলেন— আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমার সাথি হলো। সে ওঠাবসা, চলাফেরা সব অবস্থায় দরুদ শরিফ পাঠ করছিল। আমি তার এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল— আমি যখন প্রথমবার মক্কা শরিফ যাচ্ছিলাম, তখন আমার সাথে আমার পিতা ছিলেন। আমরা যখন মক্কা শরিফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন পথিমধ্যে এক মঞ্জিলে এসে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি ঘুমন্ত ছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল— ওঠো! দেখ আল্লাহ পাক তোমার পিতাকে মৃত্যু দান করেছেন এবং তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ করে দিয়েছেন। আমি ভয়ে ভয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। পিতার মুখমণ্ডলের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে তাকে মৃত ও তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ দেখতে পেলাম। তার এই অবস্থা দেখে আমার খুব ভয় হয়েছিল। এই অবস্থায় আমি পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে চারজন কৃষ্ণকায় হাবশী লোক লোহার চারটি হাতুড়িসহ আমার পিতার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় সবুজ বর্ণের পোশাক পরিহিত একজন সুদর্শন বুজুর্গ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এসে তাদেরকে বললেন— এখান থেকে সরে যাও। তারপর নিজের পবিত্র হাত দ্বারা আমার পিতার মুখমণ্ডল মুছে দিলেন এবং আমার কাছে এসে বললেন— ওঠো, আল্লাহ পাক তোমার পিতার মুখমণ্ডল শুভ্রবর্ণ করে দিয়েছেন। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম— আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোন। আপনি কে? পরিচয় দিন। তিনি বললেন— আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি জাগ্রত হলাম। পিতার মুখমণ্ডলের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেখলাম যে বাস্তব পক্ষেই আমার পিতার মুখমণ্ডল নূরানি হয়ে গেছে। ওই দিন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা ক্ষান্ত করিনি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— একদা আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে তার সাথে দেখলাম। আমি তাদেরকে সালাম করে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের (রাঃ) মাঝখানে বসে পড়লাম। এমতাবস্থায় হযরত

আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাদেরকে আমার সামনে একটি কক্ষে দরজা বন্ধ করে রাখা হলো। কতক্ষণ পর হযরত আলী (রাঃ) এই কথা বলতে বলতে বের হয়ে এলেন— "কাবার রবের কসম করে বলছি যে, আমার জন্য এই আদেশ হয়েছে।" তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এই কথা বলতে বলতে বের হয়ে এলেন— "আমাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।"

একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ করে ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলেন এবং বললেন যে— আল্লাহর কসম, ইমাম হোসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালাতে শহীদ হওয়ার পর শহীদ হওয়ার সংবাদ মদিনাতে পৌঁছার পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই স্বপ্নটি দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্নটি বর্ণনা করার পর তার সাথিরা স্বপ্নের সত্যতা মেনে নিতে রাজি ছিল না। তখন তিনি বললেন যে— আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তার হাতে রক্ত ভরা একটি শিশি।তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মত কী করেছে? তোমার তা জানা নেই। তারা আমার আওলাদ হোসাইনকে শহীদ করে দিয়েছে। ইহা তার এবং তার সাথিদের রক্ত। ইহা আল্লাহ পাকের কাছে নিয়ে যাব। এই ঘটনার বিশ দিন পর তার শাহাদতের সংবাদ মদিনায় পৌঁছাল। হিসাব করে দেখা গেছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যে দিন এই স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেদিনই তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখল। সে জিজ্ঞাসা করল যে— আপনি নিজের জিহ্বা সম্পর্কে বলতেন যে ইহা নাকি আপনাকে ধ্বংসের স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এখন আল্লাহ পাক আপনার সাথে কী ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন— আমি এই জিহ্বা দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছিলাম, তাই আমাকে জান্নাতে স্থান করে দেওয়া হয়েছে।

চূড়ান্ত নির্বোধ কে?

যারা ইচ্ছেমতো জীবন কাটায় তাদের চেয়ে নির্বোধ আর কেউ হতে পারে না। খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে একবার বাহলুল আসে। খলীফা তখন তাকে একটি সুদৃশ্য ছড়ি তুলে দিয়ে বলেন, বাহলুল,

কোনো নির্বোধকে ছড়িটি দিয়ে দিয়ো। বাহলুল ছড়ি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

কিছুদিন পর হারুনুর রশীদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সবধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কিছুতেই সুস্থতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো না। বাহলুল খলীফার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শুশ্রূষার জন্যে গমন করেন। খলীফার কাছে এসে বললেন, হে রাজা, আপনি যখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা করেন তখন কি আপনি সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ইত্যকার বিষয় চেক করেন না? তিনি বললেন, আলবৎ, চেক করি।

জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে যদি আপনি কোনো বিষয়ের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেন তখন কি সেটি পূর্ণ করার নির্দেশ দেন না?

খলীফা বললেন, অবশ্যই, আমি সাথে সাথে তা পূরণ করি।

বাহলুল বললেন, হে মহারাজা, আপনি এখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছেন। দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পর সর্বপ্রথম আপনাকে কবরদেশে যেতে হবে। আপনি কি সেখানকার কোনো ব্যবস্থাপনা ও আয়োজনের খোঁজ-খবর নিয়েছেন?

বাদশাহ বললেন, না, নেইনি।

বাহলুল বললেন, আপনি কবরের প্রয়োজনীয় সব সামানের সবধরনের স্বল্পতা দূর করেছেন?

বাদশাহ বললেন, না।

যখন বাহলুলের কাছে খলীফা স্বীকার করলেন যে, আমি সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয়তার তদারকি করিনি তখন বাহলুল সেই ছড়ি বের করে হারুনুর রশীদকে দিয়ে বললেন– হে মহারাজা, এই পৃথিবীতে আমি আপনার চেয়ে বড় নির্বোধ আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই আপনি-ই এ ছড়ির সবচেয়ে বড় হকদার।

পরকালীন জীবনের দৃষ্টান্ত

হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ রহ.-এর পরকালভাবনা

হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ রহ.-কে বলা হয় দ্বিতীয় ওমর। তাঁর অভ্যাস ছিলো, প্রতিরাতে তিনি উলামায়ে কেরামের মাহফিল বসাতেন। সেখানে তাঁরা মৃত্যু ও পরকালের ওপর বয়ান করতেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ রহ. তাঁদের

আলোচনা শুনে এ পরিমাণ কান্না করতেন যে, মনে হতো তার সামনে জানাযা রাখা আছে।

হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ রহ.-এর কবরের সাথে আলাপচারিতা

একবার হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ রহ. তার এক আত্মীয়ের জানাযার সঙ্গে কবরস্থানে গমন করলেন। কবরস্থানে প্রবেশ করে তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে এক স্থানে বসে গেলেন। সেখানে তন্ময় হয়ে তিনি কিছু নিয়ে ভাবছিলেন। এক ব্যক্তি এসে নিবেদন করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি হচ্ছেন এই জানাযার অভিভাবক অথচ আপনি সবার থেকে আলাদা হয়ে একাকী বসে আছেন।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এখানে আসার পর একটি কবর আমাকে সম্বোধন করে বলেছে, হে ওমর বিন আবদুল আজীজ, তুমি কেন আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছো না যে, আমি এখানে আগমনকারীদের সাথে কী আচরণ করি?

আমি বললাম, অবশ্যই বলো।

সে বললো, যখন সে আমার ভেতর আসে তখন আমি তার কাফন ছিঁড়ে ফেলি। আমি তার মরদেহ টুকরো টুকরো করে ফেলি। তার দেহের অবশিষ্ট রক্ত চুষে নিই। তার দেহের গোশত খেয়ে ফেলি। আমি কি তোমাকে বলবো যে, তার দেহের জোড়াগুলোর সাথে কী আচরণ করি? আমি কাঁধকে বাহু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। বাহুকে কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। পেঁটকে রান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। রানকে হাঁটু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। হাঁটুকে গোড়ালি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। এ কথা বলে হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ রহ. কেঁদে ফেললেন। বললেন, দুনিয়াতে আমাদেরকে খুবই অল্পসময় অবস্থান করতে হবে। কিন্তু আমাদের সাথে দুনিয়ার প্রতারণা খুবই দীর্ঘ। দুনিয়াতে আজ যাদেরকে সম্মানিত দেখা যাচ্ছে পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হবে। দুনিয়াতে যারা দৌলত-সম্পদের অধিকারী পরকালে তাদেরকে শূন্যহস্ত হতে হবে। দুনিয়াতে যারা যুবক তাদের সেই রূপ-যৌবন অতি সহসাই বার্ধক্যে পরিণত হবে।

দুই বন্ধুর কথোপকথন

দুনিয়াতে দুই যুবক পরস্পরে বন্ধু ছিলেন। তাদের একজনের মৃত্যু হলে তাকে কবরে সমাহিত করা হয়। বেঁচে থাকা বন্ধু সবসময় তার কথা স্মরণ করতো। অতীতের স্মৃতিগুলো মনে করে সে কষ্ট বোধ করতো। একদিন সে বন্ধুর কবরের সামনে এসে

উপস্থিত হলো। এখানে দুই বন্ধুর সাথে যেই কথাবার্তা হয়েছিলো তা এক কবি কবিতার চরণে চরণে ফুটে তুলেছিলেন। কবিতাটি নিম্নরূপ–

একরাতে আমি বন্ধুর কবরে গিয়েছিলাম।
তখন আমার দু'চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিলো।
কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আলহামদু পাঠ করে বন্ধুকে বললাম,
হে বন্ধু, তোমার বিরহে আমাদের বুক ফেঁটে কান্না বেরোচ্ছে।
মাটির নিচে তোমার নাজুক দেহ ভালো আছে তো?
তোমার কবরের বাইরে রং-বেরংয়ের ফুল ও বাতিবাতির স্তূপ লেগে গেছে।
হে অসীম জগতের পথিক, মৃত্যুর পর কী ঘটেছে?
সেখানকার লোকেরা কেমন? তাদের জীবনযাপনের চিত্র বলো।
বাড়িগুলো কি কাছাকাছি না দূরে? কেমন অবস্থা সেখানে?
পথিমধ্যে কি বাড়ি-ঘর, জনপদ ও বাজার পড়ে?
হে বন্ধু, তুমি যেই বাড়িতে এখন উঠেছো সেটি দেখতে কেমন?
কততো বিশাল প্রাসাদ সেটি? খুটি ও স্তম্ভগুলো কী ধরনের?
ছাদগুলো কি নকশিকরা? সেখানে কতোগুলো বর্ণ রয়েছে?
তোমার ভবনের মেঝে কি টাইলস করা? কতটা মসৃণ সেটি?
সেখানকার ফুলগুলোর বর্ণ কী? পাতাগুলো দেখতে কেমন?
গোলাকার নাকি লম্বাটে? ঝালরবিশিষ্ট গুল্ম নাকি চোখামুখী?
সেখানে যখন তুমি কথা বলো, তখন কি ধ্বনির প্রতিধ্বনি ওঠে?
৪সেখানকার লোকেরা কীভাবে নিদ্রা যায়? নাকি তারা জেগে
কবর থেকে উত্তর এলো, এবার চুপ করো তো বন্ধু।
এখানে আমি নিঃসঙ্গ আছি, কোনো বন্ধু নেই, কোনো শত্রু নেই।
পৃথিবীতে তুমি আমার যেই নরম ও কোমল গাত্র দেখেছিলে,
আজ তার ওপর এই কবরে কয়েক মন মাটি চেপে রয়েছে।
আজ তোমার সাথে আমি বেশি কথা বলতে পারবো না। তুমি ঘরে ফিরে যাও।
আমাকে নিয়ে মনের ভেতর কোনো কষ্ট লালন করো না। এখানে সবাই অসহায়।
কারো কিছু করার নেই।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদি.-এর ফরমান

আমরা আমাদের দু'চোখে অজস্র স্বপ্নের ফানুস মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনো স্বপ্ন দেখছি যে, দামী প্রাইভেটকার কিনবো, কখনো স্বপ্ন বুনছি যে, বড় পদে অধিষ্ঠিত হবো। কখনো আমি আমার সহকর্মী, আমার প্রতিবেশীদের সামনে বড় বড় উচ্চাশা প্রকাশ করছি। অথচ সাহাবায়ে কেরাম এমন ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন জামাত তৈরি করেছিলেন যে, তারা প্রতিটি দিনকে মনে করতেন, এটাই আমার জীবনের শেষ দিন। তারা সবসময় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. বলেন,

'সকাল বেলা মনে করবে না যে, আজকের সন্ধ্যা আমি অবশ্যই পাবো। সন্ধ্যা বেলা মনে করবে না যে, আমি আগামীকালের সকাল পেতে যাচ্ছি। সুস্থ থাকা অবস্থায় অসুস্থতার জন্যে প্রস্তুতি নাও। জীবন থাকা অবস্থায় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করো'।

প্রাত্যহিক পত্রিকার পরিসংখ্যান

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ পরিসংখ্যান এসেছে যে, প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীতে পনেরো লাখ মানুষ মরে যাচ্ছে। হয়তো সেই মৃত্যু মৃদুপায়ে চুপিসারে আপনার উঠানেও এসে পড়েছে।

ইমাম গাযালী রহ.-এর বাণী

ইমাম গাযালী রহ. বলেন— হে বন্ধু, কতোবার দেখেছি, তুমি তোমার বিয়ে-শাদী নিয়ে ব্যস্ত আছো, তোমার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মগ্ন আছো, তোমার ঘরের কাজ-কর্ম নিয়ে লিপ্ত আছো, অথচ তোমার নাম মৃতদের তালিকায় উঠে গেছে। তোমার রূহ কবয করার জন্যে মৃত্যুর ফেরেশতা রওয়ানা হয়েছেন।

ইমাম গাযালী রহ. একটি বিস্ময়কর কথা লিখেছেন। তিনি তার কিতাবে লিখেছেন, হে বন্ধু, তুমি কি জানো, বাজারে সেই কাপড় পৌঁছে গেছে যা তোমার কাফন হবে। তুমি এখনো খোশআলাপে মত্ত আছো অথচ দোকানদার তোমার কাফনের কাপড় নিয়ে প্রস্তুত আছে। শীঘ্রই সেই কাপড় তোমার কাছে পৌঁছতে যাচ্ছে।

কবরের নিঃসঙ্গতা

আমরা মৃত্যুর কথা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু মৃত্যু আমাদের কথা ভুলবে না। এক হাদীসে এসেছে, প্রতিটি ব্যক্তির কবর প্রতিদিন ৭০ বার তার কথা স্মরণ করে। কবর তাকে উদ্দেশ্য করে বলে,

‘আমি হলাম নিঃসঙ্গের ঘর, আমি হলাম অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটির, আমি হলাম সাপ-বিচ্ছুর বসতভিটা।’

‘আমি হলাম সাপ-বিচ্ছুর বসতভিটা।’

কাজেই আমার কাছে আসতে হলে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে। পৃথিবীতে তুমি উন্নত আবাসিক এলাকায় বাড়ি বানিয়েছো, বাগানবাড়ি বানিয়েছো, প্রমোদভবন বানিয়েছো, তোমার বাড়ি-ঘর আজ জনাকীর্ণ কোলাহলমুখর। কিন্তু কবর হচ্ছে নীরব নিস্তব্ধ। সেই পিনপিনে নীরবতার বাড়ির কথা এখন স্মরণ করো। সেখানে একবার গেলে আর কোনো প্রতিবেশী পাবে না। কোনো সুহৃদ এসে সেখানে তোমার সাথে আড্ডা দেবে না। সেখানে শুধু তোমার কবরটাই থাকবে। ফেরেশতারা থাকবেন। সেখানে তোমার হিসেবে তোমার নিজেকেই দিতে হবে। দুনিয়াতে তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমার বিপদে এগিয়ে আসতো। ধন-সম্পদ কাজে লাগতো। কিন্তু কবরে কী হবে? আল্লাহ বলেন,

‘কিয়ামতের দিন তোমার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তত; কিছুই কাজে আসবে না। সেখানে তো শুধু সুশোভিত ও প্রশান্ত হৃদয়ই কাজে আসবে’।

হযরত উসমান রাদি.-এর প্রচণ্ড কান্না

হযরত উসমান রাদি. কবর দেখলে এ পরিমাণ কাঁদতেন যে, তার ঘন দাড়িগুলো ভিজে যেতো। একবার একজন বললেন, আপনি কবর দেখে কেন এতো কাঁদেন? বললেন, এটি হচ্ছে পরকালের সর্বপ্রথম ঘাটি। এখানে যে পার পাবে পরবর্তী সব ঘাটি তার জন্যে আসান হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এখানে যে আটকে যাবে তার জন্যে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিন হবে।

ঘুম থেকে উঠে মুমিনের ভাবনা

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যা করি; যেমন পানাহার, চলাফেরা, ঘুম ইত্যাদি, এগুলো যদি আমরা নবীজীর সুন্নত অনুযায়ী করি, সকল কাজের শুরু-শেষের মাসনূন দুআগুলো পড়ি তাহলে এ কাজগুলোও নেকী অর্জনের মাধ্যম হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে আমরা অগণিত নেকী লাভ করতে পারব এবং আমলের খাতা সমৃদ্ধ করতে পারব।

নিয়ত ও সুন্নাহসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণের দ্বারা দৈনন্দিন জীবনের এসব আদত-অভ্যাস ও কর্মই হয়ে যায় নেকী অর্জনের মাধ্যম। তাই মুমিন যখন খাওয়া ও ঘুমের মত অভ্যাসগত কাজগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নবীজীর সুন্নত অনুযায়ী করে এর দ্বারা মুমিন অজ্‌র নেকী লাভ করে।

দৈনন্দিন কাজের শুরু ও শেষের মাসনূন দুআগুলো মুসলিম উম্মাহ্র এক মহা সম্পদ। উম্মাহ্র প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহামূল্যবান তোহফা। এগুলোর অর্থ ও মর্ম এবং ভাব ও আবেদন অনেক গভীর। এগুলোর শব্দে শব্দে ফুটে উঠেছে রাব্বে কারীমের সামনে বিনীত বান্দার হৃদয়ের আকুতি।

বান্দা কীভাবে তার মালিককে সম্বোধন করবে, কীভাবে তাঁর সামনে নিজেকে পেশ করবে, কীভাবে রাব্বে কারীমের হামদ-শোকর ও প্রসংশা-কৃতজ্ঞতা আদায় করবে- তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এসকল দুআ। এতে যেমন আছে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তেমনি জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বোঝার শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা। এগুলো বান্দাকে ভাবতে শেখায়, জীবনের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে সহায়তা করে। সব কাজে মুমিনের ভাবনা কেমন হবে, মুমিনের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, চাওয়া-পাওয়া কেমন হওয়া উচিত- তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে দৈনন্দিন জীবনে পঠিত বিভিন্ন দুআয়। যদি প্রতিটি কাজের আগে-পরের দুআগুলো গুরুত্বের সাথে পড়া হয় এবং এর অর্থ ও মর্ম নিজের মাঝে ধারণের চেষ্টা করা হয়; তাহলে তা হবে আল্লাহর সাথে বান্দার গভীর ভালবাসা ও মজবুত সম্পর্কের সেতুবন্ধন।

এ দুআগুলোর শব্দে শব্দে বান্দার আবদিয়াত ও দাসত্ব, তুচ্ছতা ও অসহায়ত্ব এবং তার হৃদয়ের ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটে। এসব দুআর মাধ্যমে মহান সত্তার সামনে নিজের দুর্বলতা ও অযোগ্যতার এবং তার বড়ত্ব ও মহত্বের গভীর প্রকাশ ঘটে। একারণেই এগুলো মুমিন বান্দার অন্তরে সৃষ্টি করে শোকরগোযার ও বিনয়াবনত হওয়ার অনুপম শিক্ষা। আর বান্দা যখন এ অনুভ‚তি নিয়ে মহান মালিকের দরবারে দুআ নিবেদন করতে পারে তখন তার দেহ-মন তথা গোটা সত্তা লাভ করে অনাবিল আনন্দ ও জান্নাতী প্রশান্তি।

তাই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কাজেই দুআ শিক্ষা দিয়েছেন।

এসকল দুআর একটি হল, ঘুম থেকে উঠে আমরা যে দুআ পড়ি-

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

অর্থ : প্রশংসা সব আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে (ঘুম নামক) মৃত্যু দেয়ার পর আবার জীবিত করেছেন। আর তাঁর কাছেই আমাদের পুনরুত্থান হবে (ফিরে যেতে হবে)। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৯৪

ঘুমালে মানুষ জীবন ও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাগ্রত হওয়ার পর শরীরে কিছুটা জড়তা থাকে। ঘুম ঘুম ভাব থাকে। আড়মোড়া দিয়ে ধীরে ধীরে সজাগ হয় একজন মানুষ। আবার জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্মে যুক্ত হয়; ঘুমানোর কারণে যা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এ যেন জীবনের নতুন সূচনা! এসময়ও বান্দা যেন তার মালিককে না ভোলে। দীর্ঘক্ষণ ঘুমের গাফলত যেন তাকে গাফেল না করে দেয় এবং আল্লাহ যে তাকে আবার জীবন ও জগতের সাথে যুক্ত হওয়ার তাওফীক দিলেন- এর কৃতজ্ঞতা যেন বান্দা আদায় করে। এ উদ্দেশ্যেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ শিখিয়েছেন-

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النّشُورُ.

এ শব্দগুলোর উচ্চারণ এবং একটু ভাবনা আমাকে নিয়ে যেতে পারে মালিকের খুব সন্নিকটে, যার নৈকট্য লাভ মুমিন-জীবনের সাধনা-কামনা। পাশাপাশি এ দুআ সুন্দরভাবে দিনটি শুরু করে নতুনভাবে সুন্দর একটি জীবন গড়ে তোলার প্রতি উদ্যমী করে তোলে। সাথে সাথে বান্দা যেন আখেরাত না ভোলে এবং এ মৃত্যু থেকে জীবন লাভের সময় আসল মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে ভুলে না যায়- এ দুআ ও তার শব্দ-মর্ম আমাদের সামনে এ শিক্ষাকেও খুব স্পষ্টভাবে মেলে ধরে।

আমরা জানি, ঘুম হল মৃত্যুর মত। এজন্যই বলে- النوم أخو الموت -ঘুম মৃত্যুর ভাই। এই ঘুম থেকে আল্লাহ আমাকে জাগ্রত করেছেন এবং নতুন একটি জীবন দান করেছেন। আর প্রতিটি দিনই তো জীবনের নতুন সূচনা। পৃথিবীতে একটি জীবন যেমন একবারই আসে তেমনি জীবনের একটি দিনও একবারই আসে। একবার চলে গেলে কখনো তা আর ফিরে আসে না। প্রতিটি নতুন দিন যেন নতুন নতুন এক একটি জীবন।

আল্লাহ যেন বান্দাকে বলছেন-

হে বান্দা! ঘুম থেকে উঠে তুমি আমাকে স্মরণ করো। একটু ভাব, দিন শেষে ক্লান্তিভরা শরীর নিয়ে তুমি ঘুমিয়েছিলে। তখন তোমার শরীরজুড়ে নেমে এসেছিল প্রশান্তির ঘুম। তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠেছ সকল ক্লান্তিমুক্ত শরীরে। আর পেয়েছ নতুন একটি নিআমত, একটি নতুন দিন, আরো অনেক কাজ করার

সুযোগ, অনেক নেকী কামাইয়ের সুযোগ, জীবনটাকে আরো একটু এগিয়ে নেয়ার সুযোগ।

তাই তুমি শোকর কর। তোমার মত কতজন ঘুমিয়েছিল, কিন্তু তার জীবনে আর আসেনি এমন একটি দিন! এ রাতের ঘুমই ছিল তার শেষ ঘুম! জীবন থেকে অর্জন করার সুযোগ তার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু নেক আমলের পরিমাণ আরো একটু বৃদ্ধি করার সুযোগ তুমি পেয়েছ। এ মহাসুযোগ যেন তোমার গাফলতের ঘোরে নষ্ট না হয়ে যায়।

তাই তুমি অন্তরের গভীর থেকে শোকর কর। দেহ-মন উজাড় করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর। বলো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা কেবল তোমার। আমাকে তুমি নতুন একটি দিন দিয়েছ। তোমার প্রতি আমি অক্ষম বান্দার হাজার শোকর। একদিন আমি তোমার সামনে উপস্থিত হব। তোমার দেয়া এ দিনটি থেকে আমি যেন অর্জন করতে পারি সেদিনের জন্য কিছু পাথেয়। আর তোমার রহমত ও করুণা দিয়ে ভরে দিও আমার এ জীবন। অধম বান্দার এই শুধু প্রার্থনা। এর প্রতি উত্তরেই বান্দা যেন ঘুম থেকে উঠেই বলছে-

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

প্রশংসা সব তোমার হে আমাদের রব! তুমিই তো ঘুম নামক মৃত্যুর পর আমাকে আবার জীবিত করেছ, দান করেছ নতুন এক দিন, নতুন এক জীবন। আর আমি বিশ্বাস করি, ছোট মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ধারা শেষ হয়ে একদিন চূড়ান্ত পুনরুত্থান হবে এবং তোমারই কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে। দাঁড়াতে হবে তোমার সামনে। আজকের এ ক্ষণস্থায়ী সুন্দর দিনের মত চিরস্থায়ী সুন্দর দিন দান করো আমাকে- এ-ই প্রার্থনা।

এমনই সুন্দর ও পবিত্র অনুভুতি নিয়ে মুমিন বান্দা ঘুম থেকে উঠবে- এই শিক্ষাই দেয় ইসলাম। একটু কল্পনা করি, একজন মানুষ ঘুম থেকে উঠছে আর এভাবেই নিজেকে সমর্পণ করছে আল্লাহর সামনে। দিনটি তখন তার কত সুন্দর কাটবে! এই পবিত্র অনুভ,তির পরশ তার জীবনকে কত পবিত্র করবে! আর ঘুম থেকে ওঠার সময়ের এ অনুভ,তি যদি সে ধারণ করতে পারে সারা দিনের সব কাজে তখন তার দুনিয়ার জীবন হবে জান্নাতী জীবন।

প্রত্যেক মুমিনের চিন্তা, অনুভব ও অনুভ,তি এমনই হোক। আর এক্ষেত্রে ঘুম থেকে ওঠার পরের দুআ এবং প্রাত্যহিক কাজের দুআগুলো হতে পারে সর্বোত্তম সহায়ক।

[মাসিক আল-কাউসার, বর্ষঃ১৬, সংখ্যাঃ৯, *মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান]*

শেষ কথা

পরিশেষে বলা যায়, আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস কেবল ইসলামের একটি তাত্ত্বিক আকীদা বা বিশ্বাস নয়, বরং এটি মানবজীবনকে আমূল বদলে দেওয়ার এক অবিনশ্বর চালিকাশক্তি । এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতের মোহাচ্ছন্নতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে এক শাশ্বত ও প্রকৃত সফলতার পথ দেখায় এই বিশ্বাস । একজন মুমিন যখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজের হিসাব আল্লাহর দরবারে দিতে হবে, তখন তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এক আমূল পরিবর্তন আসে । এই বিশ্বাস মানুষকে একদিকে যেমন ভোগবিলাস, অন্যায়-অবিচার, যুলুম এবং পাপের পথ থেকে দূরে রাখে, অন্যদিকে তেমনি সততা, নৈতিকতা, আল্লাহর দাসত্ব ও পরোপকারে উদ্বুদ্ধ করে ।

মৃত্যু কোনো সমাপ্তি নয়, বরং এটি অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার—এই মহাসত্য মানুষের মনে জাগতিক দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণের এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার অনুপম শক্তি জোগায় । এই বিশ্বাসহীন জীবন মূলত উদ্দেশ্যহীন এবং চূড়ান্ত অর্থেই ব্যর্থ। তাই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন জান্নাত লাভের একমাত্র উপায় হলো অন্তরের গভীরে আখিরাতের চেতনাকে জাগ্রত করা এবং সেই অনুযায়ী প্রাত্যহিক জীবনকে সুন্নাহর আলোতে সাজানো । মূলত, আখিরাতের এই মেহনত ও প্রস্তুতির মাঝেই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত ।

মনের ভেতর আল্লাহকে রাখুন

জনৈক বুযুর্গ তোতা পাখি পালতেন। তিনি তোতা পাখিকে ‘আল্লাহ আল্লাহ’ শিখিয়েছিলেন। এই তোতা পাখি যখন ‘আল্লাহ আল্লাহ’ করতো তখন তিনি খুবই খুশি হতেন। ঘটনাক্রমে একদিন পিঞ্জরার মুখ খোলা ছিলো। ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে সেই তোতা পাখির ওপর আক্রমণ করলো। আহত তোতা তখন ‘টি টি’ করছিলো। বুযুর্গ তো অবাক। আমি ওকে আল্লাহ আল্লাহ শিখিয়েছি আর ও এখন টি টি করছে।

কিছুক্ষণ আরেক বুযুর্গ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি আগত বুযুর্গকে পূর্ণ ঘটনা শোনালেন। তিনি ঘটনা শুনে মন্তব্য করলেন যে, আপনি যেহেতু তোতা পাখিকে আল্লাহ আল্লাহ শিখিয়েছিলেন এজেন্যে তার মুখে তো আল্লাহ আল্লাহ এসেছে কিন্তু মনের মধ্যে ছিলো, টি টি। এ কারণে যখন তার ওপর বিড়াল আক্রমণ করে আর মৃত্যুকে সে চোখের দোরগোড়ায় হাজির দেখতে পায়, তখন তার মুখ থেকে সেটাই বেরিয়ে যা তার মনের মধ্যে ছিলো। বলুন, আজ আমাদের মনের মধ্যে কী আছে?

কাজেই আজ যদি মনের ভেতর আল্লাহকে না রাখা হয়, আমরা যদি আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে মহান আল্লাহকে না রাখি, তার নূরের ঝলকানি দিয়ে আমাদের মনোজগত আলোকিত না করি, আমাদের অন্তকরণে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে মৃত্যুর সময় কীভাবে আমাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ বেরোবে? কাজেই আমাদেরকে এর জন্যে মেহনত করতে হবে। সেই মেহনতের জন্যেই আমাদেরকে এই গোটা জীবন দান করা হয়েছে।

রেফারেন্স

১। আল-কুরআন,সুরা জুমুআ,আয়াত-৮

২। সূরা সজদা: ১১

৩। সুরা রুম : ৭

৪। সুরা মুমিনুন : ১-১১

৫। মুসলিম, মিশকাত : ৫১৫৭

৬। সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫

৭। তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/১৭৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০১৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৪১৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩১৭০

৮। সূরা মুমিন (৪০) : ৯

৯। সূরা আনআম (৬) : ১৬

১০। সূরা হাদীদ (৫৭) : ১২

১১। সূরা সাফফাত (৩৭) : ৬০-৬১

১২। সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ২৬
১৩। আত তাহরীর ওয়াত তানভীর : ৩/১৭৪
১৪। আল ইবতিহার ফীমা আকা দালুশ শু'আরাউ মিনাল আসার : ১/২৯
১৫।সূরা (২) বাকারা: ৬২ আয়াত
১৬। সূরা ইউনুস : আয়াত-৫৭, ৫৮
১৭। সূরা আল-কাসাস : আয়াত-৮৩
১৮। সপ্তম অধ্যায়, রূহের রহস্য
১৯। মাসিক আল-কাউসার, বর্ষঃ১৬, সংখ্যাঃ৯, *মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান*
২০। রূহের রহস্য,আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম
২১।অনিবার্য মৃত্যুর ডাক,শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী
২২।আখেরাত,ইমাম গাযযালী (রহঃ)
২৩।আল-কুরআন
২৪। সহিহ হাদিস(বুখারী,মুসলিম)
২৫। WhyIslam. (2017, October 9). *The importance of belief in life after death in Islam.* WhyIslam. https://www.whyislam.org/lifeafterdeath/